বুদ্ধিধরের আজব কাণ্ড

[illegible]

শৈল চক্রবর্তী

প্রগতি লাইব্রেরী ।। ৮বি/১, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

কি কি গল্প আছে

ভূমিকা

প্রোঃ বুদ্ধিধর বলেন, বিজ্ঞান কোথায় নেই ? শরীরের অন্তর্গত যন্ত্রপাতি থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত। এমন কি খেলাধুলা ও এথলেটিক্সে পেশীর বাড়তি শক্তি যোগান দিচ্ছে সেও বিজ্ঞান।

মানুষ বিজ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কত কি নিয়েছে ও নিচ্ছে তার হিসাব রাখবে কে ? তাইত উনি বলেন মানুষ খেটে মরে শুধু বুদ্ধিদোষে। বিজ্ঞানকে কামধেনু বললেই হয়, সেই ধেনুকে কেবল দুয়ে নিলেই হল।

এই ত সেদিন মৌসুমীর চিঠি পেয়ে তিনি জানলেন যে বেচারার ক্লাশ নাইনের পড়ার চাপ, আরও কত কিছু পড়তে হয়, কিন্তু চোখটি খারাপ। হাই পাওয়ার লেন্স। মাসীমার মহাভারত পড়া হয় না সেই একই কারণে। পৃথিবীতে প্রতিদিন আমাদের জানা ভাষায় পত্র-পত্রিকা বেরুচ্ছে রাশি রাশি, বই ছাপা হচ্ছে পাহাড়-প্রমাণ—কত পড়বে মানুষ ? সময় কোথা ? চোখ ব্রেন এত খাটতে পারবে কেন ? তাই ত ওঁর ল্যাব থেকে বেরিয়ে এল অটো-রীডার। ওঃ ! দুর্গাপুরে কী সেনসেশান ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালাতে গলদ হওয়ায় একটু ভুলের জন্যে সে এক হাসি ও মজার পরিস্থিতি। অবশ্য এ আবিষ্কারে মজা থাকলেও সবটা হাস্যকর নয় কিন্তু।

এই রকম অজস্র গল্প থেকে বেছে বেছে কয়েকটি নিয়ে এই সংগ্রহ। এ গল্প সবই ইতোপূর্বে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত। কিশোর থেকে ক্ষুদে ও বড় পাঠকেরা আনন্দ পেলে তবেই আমার লেখা সার্থক মনে করব।

লেখক

হ্যাঁ, প্রোফেসার বুদ্ধিধরের কথাই বলছি।

বয়েস বাহান্নর কাছাকাছি হলে কি হবে উৎসাহের কমতি নেই। কমতি থাকবে কেমন করে? তাঁর মাথায় আইডিয়া গিশগিশ করছে যে।

এই তো গত বছর তিনি লেগেছিলেন কাঠকে পাথর করা যায় কিনা এই নিয়ে। তাঁর ফসিল সম্বন্ধে গবেষণার কথা কে না পড়েছে?

কাঠকে যদি পাথর করা যায় তাহলে পাথরকেও কাঠ করা যাবে না কেন? প্রস্তরীভূত কাঠকে আবার পাথর করা যে যাবে এ বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। কাজও আরম্ভ করেছিলেন। তাই না, টিম্বার মার্চেণ্টরা ঘনঘন প্রোফেসারের বাড়ি হানা দিত আর ধরনা দিয়ে বসে থাকত। তাদের অভিপ্রায় গবেষণা সাকসেসফুল হলেই তারা দেওঘরের ত্রিকুট পর্বতের ইজারা নেবে। পাথরকে কাষ্ঠায়িত করে চেরাই করে খাঁটি বর্মা টিক বানিয়ে বাজারে ছাড়বে।

কিন্তু হল না। প্রোফেসারের ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যাওয়ায় তাঁর ওই একস্পেরিমেণ্ট আর এগুতে পারে নি। অবশ্য সেরে ওঠার পর আবার নতুন এক আইডিয়া তাঁকে পেয়ে বসল।

এর আগে তাঁর আর একটি চাঞ্চল্যকর আবিষ্কারের কথা কে না জানে? সে ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত।

বাংলাদেশের বর্ষা। কলকাতায় সেবার সাতদিন সাতরাত অবিরাম বৃষ্টিতে সারা শহর জ্যাবজ্যাব করছে। বড় বড় রাস্তায় তিন চার হাত

জল দাঁড়িয়ে। বাচ্চারা কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট দিয়ে সালতি বেয়ে চলেছে। আপিস-আদালত বন্ধ। গাড়ি-ঘোড়া, ট্রাম-বাস অচল।

প্রোফেসার তাঁর ল্যাবরেটরির জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন চারদিক জলে থৈ থৈ করছে। রাস্তায় হাঁটার উপায় নেই। খবর নিয়ে জানলেন ট্রাম বাস ট্যাক্সি সব বন্ধ। হবেই। কলকাতায় যা হয়। ছিঃ ছিঃ! বিজ্ঞানের সুযোগ এরা নিল না।

অথচ তাঁকে একটা কেমিক্যাল কিনতে যেতেই হবে! সাঁতার কাটবেন

নাকি ? জামা প্যাণ্ট ভিজে সে তো এক বিদিকিচ্ছি ব্যাপার হবে ! একটা লণ্ঠ বানাবেন ? সেও তো সেকেলে ব্যাপার। আর সময়ও লাগবে। ধুন্তারিকা, বিজ্ঞানী হয়ে সেই আদ্যিকালের মানুষের মত নৌকো আর সাঁতার কাটা ! ছিঃ—

একবার ভাবলেন জলটাকে শুকিয়ে ফেললে কেমন হয় ? উঁহু, দরকার নেই। তিন দিন তিন রাত্তির খেটে এক বুদ্ধি বার করলেন তিনি। তারপর গটগট করে জলের ওপর দিয়েই হেঁটে চললেন।

কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রীর সেলস ম্যানেজার দেখে অবাক। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, এলেন কি করে স্যার ? এযে ট্যাক্সিও চলছে না।

সে কথা পরে বলছি, আগে এক পাউণ্ড অ্যামোনিয়াম সল্ট দাও দেখি সায়েব।

তারপর এ কথা সে কথার পর ম্যানেজার বলল, আমি তো আজ তিনদিন অপিসে আটকা। বাড়িতে কেবল ফোন করি আর খবর নিই। অপিসের টেবিলে শুয়ে শুয়ে পিঠের হাড়গুলো টনটন করছে। খাওয়া দাওয়া সেই দারোয়ানের তৈরি চাপাটি আর অড়হর ডাল।

তোমরা না সায়েন্স নিয়ে কাজ কর সাহেব ? এটা ম্যানেজ করতে পারলে না ?

সায়েব থ' হয়ে তাকিয়ে থাকে।

এই দেখ, প্রোফেসার বললেন, পা দুটোর দিকে তাকিয়ে দেখ। এই পা দিয়ে আমি তো জলের ওপর দিয়ে দিব্যি হেঁটে এলুম। প্যাণ্ট ভিজেছে ? দেখো।

মাই—সায়েবের চোখ গোলাকার হয়ে যায়। জলের ওপর দিয়ে হেঁটে ? হ্যাঁ, তাই তো দেখছি, জুতোটাও ভেজে নি।

—বাট, হাউ কুড্ ইয়ু ?

কিছুই না সায়েব, একটু মাথা খাটালেই হয়। রহস্যটা তাহলে কি শুনতে চাও ? যদি ওয়ার্ড দাও এটা পেটেণ্ট করবে না, তাহলে—

ও নো নো, আই গিভ ইউ ওয়ার্ড—তোমার জিনিস আমি নেব কেন ? তবে আমি খুব কিউরিয়াস। জানতে চাই। তোমাদের সাধুরা নাকি যোগবলে এসব করেন, সে রকম কিছু একটা নাকি ?

মোটেই নয়।—ইট ইজ সিম্পল সায়েন্স। এই দেখ আমার জুতোর

সোলে একটা হাই পাওয়ার ফ্রিজিং অ্যাপারাটাস ফিট করা আছে। জলে পা পড়লেই সেখানকার জলটা সঙ্গে সঙ্গে বরফ হয়ে জমে যায়। তার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো তখন আর শক্ত কি? এমনি করে একটা একটা পা ফেললেই হল।

সায়েব ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখল, সত্যিই পায়ের সঙ্গে কত কি জড়ানো রয়েছে প্যাণ্টের ভেতর থেকে তার ঠিক নেই।

জোরে একটা হ্যাণ্ডশেক করে সেণ্টের বোতল হাতে নিয়ে প্রোফেসার সেই জলের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আবার পাড়ি দিলেন।

প্রোফেসারের বাড়ির কাছেই বটুকবাবুর বাড়ি। বটুকেশ্বর রোগা-সোগা গোবেচারা গোছের লোক। করপোরেশনে কাজ করেন, গানের শখ আছে আবার ছবি তোলারও একটু নেশা আছে। একটা ছোট ক্যামেরা আছে। রবিবার কি ছুটিছাটার দিন ফিল্ম ভরে এখানে সেখানে ক্লিক্ ক্লিক্ করে ছবি তোলেন। বারোটার মধ্যে হয় তো তিনটে ছবি ভাল হয়।

বটুকবাবুর ছেলে বাবলু ক্লাস ইলেভেনে পড়ে। তার কিন্তু ঝোঁক পড়ার চেয়ে ঐ ক্যামেরার দিকে। লুকিয়ে ফিল্ম আনিয়ে ছবি তুলে সে হাত পাকিয়েছে মন্দ নয়। কিন্তু তার ঝোঁক হচ্ছে অদ্ভুত ছবি তোলার, যাকে বলে আনইউসুয়্যাল। ওপর থেকে বা নীচে থেকে কিংবা কোন অস্বাভাবিক কোণ থেকে। এ রকম ছবি সে কিছু কিছু তুলেছে বটে কিন্তু প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারে নি।

বটুকবাবু সন্ধ্যার পর সিগারেট টানতে টানতে প্রোফেসারের বাড়িতে এসে দরজায় টোকা দিলেন। দরজার ওপর লেখা আছে, তিন বারের বেশি টোকা দেওয়া নিষিদ্ধ—গবেষণার কাজে ব্যাঘাত হতে পারে।

তাই বটুকবাবু তিনবার টোকা দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। সিগারেটটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল কিন্তু দরজা খোলে না। পা দুটো টনটন করছে এমন সময় নিঃশব্দে দরজার ফাঁক দিয়ে কালো একরাশ গোঁফদাড়ি দেখা গেল।

কাম ইন, কালো গোঁফদাড়ি বলে উঠল। তোমার কথাই ভাবছিলাম। কাল সারা রাত্তির—ঘুম নেই—বুঝলে। হোল নাইট ওয়ার্ক—

এবার কি নিয়ে কাজ চলছে?

এস দেখাচ্ছি।

ভেতরে নিয়ে গিয়ে প্রোফেসার বললেন, বোসো মিত্তির। একটা গুরুতর জিনিস সলভ করেছি। গ্র্যাভিটেশন জানো ?

জানি বইকি, মাধ্যাকর্ষণ তো ?

হ্যাঁ, বাংলায় বললে জিনিসটা আরো যেন শক্ত শোনায়। মোটকথা মানে একই, যাক—এই গ্র্যাভিটেশন নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলুম আজ সাত মাস। না, সরি, সাত মাস ছাব্বিশ দিন। কাল রাত্তির তিনটেয় তার ফল পেলুম। সাকসেসফুল, বুঝলে ? দশরথকে বলি দুকাপ কফি নিয়ে আসুক।

পাশের কামরায় ভৃত্যকে অর্ডার দিয়ে প্রোফেসার বুদ্ধিধর বসলেন একটা লোহার চেয়ারে।

আচ্ছা, গ্র্যাভিটেশন তো নিউটন আবিষ্কার করেন ? তাই নয় ? বটুক তার ছাত্রবেলার পাঠ্য বইএর স্মৃতি দিয়ে পূর্বের প্রসঙ্গকে টেনে আনলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো বহু যুগ আগের কথা। তারপর কত কি হল। এখন তো রাশিয়া আমেরিকা চাঁদে যাবার জন্যে লাফালাফি করছে। এই গ্র্যাভিটেশন কাটিয়ে উঠতেই এদের কদিন গেল। ওই যে রকেট নিয়ে ওরা নাড়াচাড়া করছে, তাও কি আজকের কথা! গডার্ড সায়েব রকেট বার করল সেই ছাব্বিশ সালে। এখন অনেকগুলো খাড়া করেছে বটে কিন্তু পৃথিবীর টানকে ঠেকাতে পারছে কই ? জেট ফেট কত কি করল। বিরাট ইঞ্জিন, রাশি রাশি গ্যাস তৈরি ক'রে ছাড়ছে নীচে—তবে তো কিছুটা উঠছে রকেট।

তাও তো অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, আর কি করবে বলুন ? বটুক মহাকাশ যাত্রার সাফল্যে যেন গদগদ।

তাহলে, মিত্তির, তোমায় দেখাই আমার জিনিসটা—

প্রোফেসার উঠে গেলেন পাশের ঘরে। একটু পরেই হাতে একটা নীল কাচের জার নিয়ে ঢুকলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে এক ঝলকে বটুকের চোখে পড়ল ঘরের মধ্যে শিশি বোতল জার ফ্লাস্ক টিউব চাকা যন্ত্র ছাড়া আরো দুর্বোধ্য হাবিজাবি কত কি রয়েছে।

এটা কি ? জিগ্যেস করেন বটুকেশ্বর।

বলছি। কাচের ভেতর দিয়ে দেখতেই পাচ্ছ কয়েকটা পিল, আমরা যাকে বড়ি বা বটিকা বলি।

কোনো ওষুধ নাকি ?

হ্যাঁ, ওষুধই বটে। গ্র্যাভিটেশনের ওষুধ।

মানে বুঝলুম না তো ?

মানে, অ্যান্টি-গ্র্যাভিটেশন। মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর যদি একটা ব্যাধি হয় তাকে ঠেকাবার ওষুধ। আরো সহজ করে বলি তবে, পৃথিবীর কোনো টান বা আকর্ষণ খাটবে না এর ওপর। আপনি তিনতলা ছাদ থেকে লাফ দিন, মাটিতে পড়বেন না।

বারে, বড় মজা তো! বটুক লক্ষ্য করলেন জারের দিকে। পিলগুলো ঢাকনার দিকে আটকে আছে দেখছি। দেখি দেখি, আমার হাতে একবার দিন না।

কিন্তু সাবধান, ভাল করে ধরবে। প্রোফেফার বটিকার জারটি বটুক-বাবুর হাতে দিলেন।

কেন, ফাটতে পারে নাকি : হাতে করে বোমা ফাটিয়েছি মশাই।

কিছুই বলা যায় না···হা হা হা হা, রহস্য করে প্রোফেসার একচোট হেসে নিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে বটুকবাবুও ঘাবড়ে গিয়ে একটু হাত আলগা করতেই কাচের জার হাত থেকে শ্লিপ করে ওপরে উঠতে থাকে। শেষে ছাদে গিয়ে ঠক্ করে আটকে যায়।

সর্বনাশ ! ইউ কেয়ারলেস ! চেঁচিয়ে ওঠেন প্রোফেসার। এই জন্যেই বলছিলুম ভাল করে ধরতে। এত কথা শুনেও বুঝতে পারলে না ওটা নীচে নামে না, ওপরে ওঠে ? পৃথিবী ওকে ঠেলে দেয়। গ্র্যাভিটেশনকে ব্যর্থ করার মালমসলা দিয়ে বানিয়েছি ওটা। এখন একটা মই দরকার যে, ওখান থেকে নামাতে হবে তো।

বটুকবাবু এতক্ষণ এই কাণ্ড দেখে অবাক্ হয়ে কথা হারিয়ে ফেলে-ছিলেন। এখন নিজের অসাবধানতার জন্যে লজ্জিত হয়ে বললেন, আপনাকে কিছু করতে হবে না সার, আমি ওটা পাড়বার ব্যবস্থা করছি।

তুমি কি করবে ! বলে নিজেই মই নিয়ে এলেন প্রোফেসার আর তাতে চড়ে জার পেড়ে আনলেন ছাদের সিলিং থেকে।

ইতিমধ্যে দশরথ দু' পেয়ালা কফি দিয়ে গেছে।

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্রোফেসার বললেন, বড়িগুলোর মজা কি জান ? ওগুলো একটা একটা থাকলে উঠবে না, কিন্তু একসঙ্গে

হলেই ওদের upward thrust মানে' ওপর দিকে ওঠবার শক্তি বেড়ে যায়। আর জল পেলে তো কথাই নেই।

কি দিয়ে তৈরি করলেন স্যার? বটুকের ঠোঁটে ওই একটা প্রশ্নই এল।

সে অনেক ব্যাপার। বিশেষ কতকগুলো বস্তু আগে সংগ্রহ করতে হয়েছে। সেগুলোর মলিকিউল ভেঙে হাইড্রোজেনে জারিয়ে তাদের বস্তুভার শূন্য করা হয়েছে। প্রথমে লিকুইড তারপর পাউডার পরে তা থেকে ক্যাপসুল। সে সব জটিল ব্যাপার তুমি বুঝবে না। তবে, ভাগ্যিস ওদের potency বাড়াই নি। তা যদি করতুম তাহলে ওকি আর ছাঁদে আটকে থাকত? ছাদ ফুটো করে চলে যেত।

কতদূরে যেত?

উঠতে উঠতে সোজা চাঁদে। চাঁদের সঙ্গে ওদের আবার একটা টান আছে কিনা। পৃথিবী টানতে পারবে না ওদের কিন্তু চাঁদ টেনে নেবে। এ রকম পিল বড় জারে ভরে তার সঙ্গে ডেক চেয়ার ঝুলিয়ে দিলেই হল। সেই চেয়ারে বসে তুমি সোজা চলে গেলে চাঁদে—

টংটং করে ঘড়িতে দশটা বাজল।

বটুকেশ্বরের ক্ষিদে পেয়েছিল ঘুমও পেয়েছিল, চাঁদের কথা শুনে চোখ আরো জড়িয়ে এল।

জারটা দু'হাতে ধরে প্রোফেসার বললেন, এখন মুশকিল হয়েছে কি জান, এটা রাখি কোথায়?

বটুকবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আচ্ছা আজকের মত উঠি স্যার। একটা কথা বলব, যদি কিছু মনে না করেন—

কি বল না।

বলছিলুম, শিশিটা আমি একবার বাড়ি নিয়ে যাব? খুব সাবধানেই নেব। মানে, বাড়িতে ওদের দেখাব, মুখে বললে তো ওরা বিশ্বাস করবে না। তাছাড়া বাবলুটা আবার সায়ান্স নিয়েছে কিনা। ও একটু উৎসাহ পাবে।

তা নিয়ে যাও, কিন্তু হুঁশিয়ার! ছাড়া পেয়েছে কি ও পালাবে। এমন উপরে উঠে যাবে যে আর ওর পাত্তা পাবে না!

না না, সে বিষয় নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি তখন জানতুম না তাই,—কি বলছেন, এত বড় জিনিস! এ যে অসম্ভব কাণ্ড করেছেন আপনি। আপনাকে নোবেল প্রাইজ কেন যে দেয় না তা বুঝতে পারি না। জানেন?

ওসব ওদের হিংসে। বাঙালীকে কেউ দেখতে পারে না। কিন্তু যাই করুক জেনে রাখবেন, এইসা দিন নেহি রহেগা……

আচ্ছা, তাহলে নিয়ে যাও, ভাল করে ধরে নেবে—আমাকে আজ একটু রেস্ট নিতে হবে। কাল এটা কিন্তু আমার চাই।

বাবলু অনেকদিন থেকে ভাবছিল এমন কতকগুলো ছবি তুলবে যা দেখে লোকে 'থ' হয়ে যাবে।

তাদের বাড়ির পূর্বদিকে একটা বাগান আছে। সেখানে আম জামরুল বাতাবীলেবু গাছের ছবি তুলে সে হাত পাকিয়েছিল। গাছের তলায় ছোট বোন মিনিকে দাঁড় করিয়ে বসিয়ে এতবার সে ছবি তুলেছে যে মিনি এখন দাদার হাতে ক্যামেরা দেখলে ছুট দেয়।

বাগানের পাশে আছে একটা পোড়ো জমি। সেখানে শুধু ঘাস আর ঘাস। হ্যাঁ, আর আছে দু'এক ডজন দিনে-চরা গোরু মোষ ছাগল। তারা চরে বেড়াচ্ছে সব সময়। তাদের দাঁড় করিয়ে আবার ছবি তোলা শক্ত। ক্যামেরার দিকে চোখ রেখে ফোকাস করতে গেছ কি তারা সরে গেছে অন্য দিকে। আবার যদি তুমি সরে যাও তারাও ঠিক ঘুরে দাঁড়াবে। ঠিক যেটি দরকার কিছুতেই তারা সেভাবে দাঁড়াবে না। কি দুঃখুই যে হয় বাবলুর, ওরা যদি একটা ভাল পোজ দিতে পারত। একটু যদি ক্যামেরা-সেন্স থাকত ওদের। যাই হোক, তাও গরু ছাগলের ছবি সে কতবার তুলেছে কিন্তু সে আর এমন কি, সবাই তুলতে পারে ওরকম।

রাত্রে যখন নীল রঙের জারটি দুহাতে বাগিয়ে ধরে বটুকবাবু বাড়িতে ঢুকলেন বাবলু বলল, দেখি বাবা, ওটা কি?

এত রাত্তিরে জেলির শিশি পেলে কোথা? বললেন বাবলুর মা। দেখি আমার হাতে দাও। পেয়ারার জেলি বুঝি? ওমা, ওগুলো যে বড়ি, জেলি নয় ত।

কারুর হাতে নিয়ে কাজ নেই, বললেন বটুকবাবু, ও একটা মস্ত জিনিস। খেয়ে এসেই সব বলছি। এই বলে তাড়াতাড়ি জারটা রাখলেন একটা বাক্সে। রেখে তিনি খেতে গেলেন।

বাবলু ঘরে ঢুকে জারটা খুঁজে পেল না কোথাও। অবশেষে তার

চোখ পড়ল ওপরে। হঠাৎ দেখে, টিনের বাক্সটা ছাদের নীচে আটকে আছে। সে অবাক্ হয়ে যায়, একি ভৌতিক কাণ্ড নাকি! চেঁচিয়ে উঠে বললে, বাবা দেখে যাও! তোমার টিনের বাক্স ছাদে আটকে আছে।

কর্তা এসে সব বুঝিয়ে বললেন ব্যাপারটা এবং বললেন টিনের বাক্সে রাখার সময় খেয়াল ছিল না যে ওটা খালি বাক্স। তাই উঠে গেছে ওটা। যাই হোক, টেবিলের ওপর চেয়ার তার ওপর টুল রেখে তার ওপর উঠে দুবার আছাড় খেয়ে অবশেষে অতি কষ্টে ঘর্মাক্ত দেহে বাক্স সমেত জারটি বটুকবাবুর করকবলিত হল।

এক কাজ করা যাক বাবা, ওকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখি, বলল বাবলু।

মন্দ কথা বলিসনি।

তাই হল। বেশ করে দড়ি দিয়ে শক্ত করে জারটাকে বাঁধা হল খাটের পায়ার সঙ্গে:

সেই রাত্রি প্রভাত হয়ে যে দিন হল সে দিনটা আবার রবিবার। বাবলু সারা রাত্রি ভেবেছে ঐ আশ্চর্য জিনিসটা দিয়ে কি করা যায়। শেষে ঠিক করল, ঐ জারের সঙ্গে ক্যামেরা বেঁধে ওপর থেকে সে ছবি তুলবে। বাগানের ছবি গরু চরার ছবি, ওপর থেকে অদ্ভূত হবে, যেমন প্লেন থেকে তোলে ফটোগ্রাফ। তাকে বলে Bird's eye-view।

সে করল কি, ঐ জারের সঙ্গে সুতো দিয়ে বাঁধল তার ক্যামেরা। ক্যামেরার শাটারের সঙ্গে একটা সুতো বেঁধে ঝুলিয়ে দিল লম্বা করে। দুটো সুতোই সে ধরে রাখল দুহাতে। ক্যামেরার লেন্স নীচের দিকে ফেরানো।

ক্যামেরা নিয়ে বিকর্ষণ বড়ির শিশি ত উঠল ওপর দিকে। কিন্তু কিছুদূর উঠেই সুতোর বাঁধন আলগা হয়ে গেল। ক্যামেরা গেল পড়ে আর বাঁধন ছাড়া বিকর্ষণ বড়ির জার ওপরে ভাসতে লাগল।

সর্বনাশ! ও যে নাগালের বাইরে চলে যাবে! বাবলু ছুটল বাড়িতে। বটুকেশ্বর ত শুনেই বাজ পড়ার মত চমকে ওঠেন। ছুটলেন প্রোফেসারের বাড়ি।

কি হয়েছে কি? এমন সময় কেন?

সর্বনাশ হয়েছে স্যার। আপনার অ্যান্টিগ্র্যাভিটি বটিকা অর্বাচীন আমার ছেলের ভুলের জন্যে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

সেকি? এখন উপায়? ওকে তো আর ধরা যাবে না। হ্যাঁ,

একটা উপায় আছে, প্রোফেসার ক্ষণকাল চিন্তা করে বলে উঠেন, শিশি যাক, বড়িগুলো উদ্ধার করতেই হবে।

কালবিলম্ব না করে তাঁর বন্দুকটা নিয়ে ছুটলেন তিনি। ঘটনাস্থলে পেঁছে আকাশে নজর চালিয়ে তাঁরা দেখলেন নীল জার অনেক উঁচুতে বেশ দুলতে দুলতে উড়ছে।

তাক করে গুলি চালালেন প্রোফেসার বুদ্ধিধর। গুড়ুম্ ! যা লাগল না। আবার গুড়ুম্ ! দ্বিতীয় বারের গুলি ব্যর্থ হ'ল না। কাচের জার চুরমার হল। ভিতরের বড়িগুলি নীচে পড়ল কিন্তু কোথায় যে পড়ল কেউ দেখতে পেল না।

খোঁজো দেখি, বললেন প্রোফেসার, বড়িগুলি খুঁজে বার করতেই হবে। কাচের টুকরোয় পা বাঁচিয়ে যেও কিন্তু।

তিনজনেই খুঁজতে থাকে কিন্তু সবুজ ঘাসের মধ্যে ওই কালচে রঙের ছোট ছোট বড়ি খুঁজে পাওয়া কি এত সহজ ? একটা গরু তো গুঁতিয়ে দিল বটুকবাবুকে। আর মোষটা এমন তেড়ে গেল প্রোফেসারের দিকে যে তিনি পড়লেন আছাড় খেয়ে মাটির ওপর, মাধ্যাকর্ষণের টান ঠেকাতে পারলেন না।

আধ ঘণ্টার খানাতল্লাশী যখন ব্যর্থ হল তখন দোমড়ানো প্রোফেসার আরো দুমড়ে পড়লেন। ঘাসের ওপর বসে পড়েছেন তিনি। প্রায় ফ্ল্যাট। আহা গুলি না ছুঁড়লেই হত। না হয় শিশিটা চলে যেত চাঁদে। কি আর হত ? আমার নাম ঠিকানা লেখাই তো ছিল জারের লেবেলে—চাঁদে যদি মানুষ আবার যায় আমার নাম দেখে চিনতে পারবে।

কিন্তু ওকি ! সামনে বিভীষিকার মত গোরু দুটো আর মোষটা দাপাদাপি করছে কেন ? ছাগলটাও ওদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। প্রোফেসার শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। একটু সরে বসেন। তবে কি আর একটা অঘটন ঘটবে ?

ঘটলও তাই। বলতে বলতেই গোরু মোষ আর ছাগল লাফাতে লাফাতে ওপরে উঠতে লাগল। উঠল শূন্যে। তারা ঠেলে উঠছে আকাশে। গ্যাসে ফোলানো বেলুন যেন।

এ কি স্যার ? বটুকেশ্বরের চোখ ছানাবড়ার মত গোল হয়ে গেছে। একি অভাবনীয় দৃশ্য ! এরা তো পক্ষী শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না বলেই জানি—কিন্তু এরা বেশ অবলীলাক্রমেই উড়ছে তো !

হবেই তো ! ভীষণ বিরক্ত হন প্রোফেসার। বিজ্ঞান কি ছেলেখেলার জিনিস ? বলেছিলুম না, জল বা জলীয় বাষ্প একটু পেলে হয়, ওই বড়ির ক্ষমতা তাহলে হাজার লক্ষ্য গুণ বেড়ে যাবে। নির্ঘাত গোরু মোষের পেটের মধ্যে সেঁধিয়েছে ওই বড়ি। নির্ঘাত খেয়েছে ওরা ঘাসের সঙ্গে। এখন ঠেকাও। চাঁদে গিয়ে না হাজির হয় ওরা ! গোয়ালারা এসে মারপিট না করে। পুলিসী ফ্যাসাদ হ'তে কতক্ষণ ! সেই সব ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার আগে সরে পড়াই ভাল।

পুলিসের আকর্ষণ এড়াতেই যেন প্রোফেসার অদৃশ্য হয়ে পড়েন সেখান থেকে।

এদিকে সবাই তাকিয়ে দেখছে অভূতপূর্ব সেই গবাদি জীবের আকাশ-লীলা। পক্ষিদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যই হয়ত। শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছে ওই ধুম্বো ধুম্বো বীভৎস জীবগুলো। মোষের উড্ডয়নমান দৃশ্য আরও চাঞ্চল্য-কর। ছাগলটা তো চেঁচাচ্ছে বিশ্রী রকম। ভয়ে না আনন্দে বোঝা শক্ত।

ক্যামেরায় ফিল্ম পোরাই ছিল। বাবলু আর দেরি করল না। সট্‌সট্‌ করে যতগুলো পারল স্ন্যাপ তুলে নিল।

এর পরের খবর সংক্ষিপ্ত : গবাদি পশুগুলি অক্ষত দেহে নেমে এসেছে পৃথিবীতে। বটিকার ক্রিয়া শেষ হতেই হয়তো। শুধু মোষটার একটা পা ভেঙে যায়। তার জন্যে বটুকেশ্বরবাবুকে বেশ কিছু খেসারত দিতে হয়েছে।

বাবলু কিন্তু ওই অদ্ভুত ফটোগ্রাফগুলির জন্যে সবচেয়ে সেরা পুরস্কার যে পেয়েছিল তা অনেকেই জানেন। যদিও কেউ কেউ বলেছিল, ওগুলো 'ট্রিক ফটোগ্রাফ' ছাড়া আর কিছু নয়। মানে কায়দা করে তোলা ছবি যা আজকাল সিনেমায় দেখানো হয়।

আর প্রোফেসার বুদ্ধিধর ?

তিনি এই কাণ্ডের পর অ্যান্টিগ্র্যাভিটির আকর্ষণ মুক্ত হয়ে অন্য আইডিয়া নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলেন আর তাঁর খসড়া তৈরি নিয়ে লেগে গেছেন।

এই সময় আর একটি ঘটনার সঙ্গে বাবলুর যোগসূত্রের কথা না বললে গল্পটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিকটবর্তী ফালতুগ্রামে এক সৌখিন অর্থবান ব্যক্তি দিগন্ত দত্ত নামে পরিচিত। তাঁর চেয়ে তাঁর পত্নী দিশা দেবীর খ্যাতি আরো দিগন্ত প্রসারিত।

তিনি বাঙালি ছেলেদের খেলাধুলো ও শারীরিক অপটুতার কথা ইতোপূর্বে কাগজপত্রে লিখেছেন। ইনি একটি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন লং জাম্প ও হাই জাম্পের। দিশাদেবী এই প্রতিযোগিতার সঙ্গে লোভনীয় পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করেন।

ফালতু গ্রামের ফুটবল খেলার মাঠে এইটি অনুষ্ঠিত হবে, এ খবর বহুলোকের কানে পৌঁছেছে এবং আমাদের বটুক-নন্দন বাবলুও শুনেছে। বাবলুর একটু পুরস্কারপ্রাপ্তির লোভ ছিল না যে তা নয়। সে তাই যথাসময়ে নিজের নাম দিয়ে এণ্ট্রি করিয়েছিল।

এক শনিবারে এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষে বহু লোক বিকালে মাঠে সমবেত হয়েছে। দিশাদেবী কাছে চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থার সঙ্গে খেলা সম্পর্কিত খুঁটি পোতা, তার গায়ে ফুট ইঞ্চির মার্কা লিখে দেওয়া ও মাঠের সঙ্গে সমান্তরাল একটি লাঠি রাখার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

বাবলুর বন্ধু বিল্লু বলল কিরে বাবলু, কই তুই লং জাম্পে নাম দিসনি ?

—না ভাই, ইচ্ছে করল না। তোরা কেউ ফার্স্ট হোস।

—বা বা, আর হাইজ্যাম্পও যদি তোর ফস্কে যায় তাহলে ?

—না তা হবে বলে মনে হয় না।

খেলা শুরু হবার আগে দিশাদেবী প্রারম্ভিক ভাষণ দিয়ে বললেন, "সমবেত সব ছেলেদের কাছে আমার আবেদন—শরীরচর্চা আমরা কি ভুলে যাচ্ছি ? তোমরা নিশ্চয়ই জান, এশিয়াডে কিংবা অলিম্পিকে আমরা কি শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি। এই কি চাই আমরা ? এই কি হবে আমাদের চিরকালের পরিচয় ? দেখাও তোমরা, তোমরাও কোরিয়া চীন হংকং প্রভৃতি দেশের থেকে কম নও। আজ আমি সেইটা দেখতে চাই—তিনটে বাজে এইবার খেলা শুরু হবে।"

লং-জাম্প শুরু হল। ২২ জন কিশোর ও যুবক দৌড় দিয়ে এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াল। তারপর একে একে লাফ দিল। ফার্স্ট হল বিপ্লব, তার রেকর্ড হল ৫ ফুট ২ ইঞ্চি।

দিশাদেবী তাকে আদর করে চেয়ারে বসালেন। এবার হাইজাম্প। হাইজাম্পে ছেলের সংখ্যা কম। উঁচুদিকে লাফানো প্রাকটিসের দরকার।

একজন লাফ দিচ্ছে আর তার উচ্চতা মাপক স্টিক এক ইঞ্চি করে

তুলে দেওয়া হচ্ছে। সাড়ে তিন ফুটেই তার হাঁটু লেগে স্টিক পড়ে গেল। একে একে ৯ জন হওয়ার পর এল বাবলু। সে বলল, একটা ব্রাউন কেডস্ পরতে হয়েছে তাকে আঙুলে চোটের জন্যে। কিন্তু আসল কথা তা নয়। কেড্সের জুতোর মধ্যে সে কয়েকটি বিকর্ষণ বটিকা যা সে ঘাসের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে সঞ্চয় করে রেখেছিল, সেগুলি পুরে নিয়েছে এবং পায়ের ঘামে সেগুলি ভিজে হয়ে আছে।

ওয়ান—টু—থ্রি—বাবলু দূর থেকে দৌড়ে আসছে যেন বুলেট। তারপর লাফ দিল। মাপকাঠি তুলে দেওয়া হল দশ ফুটের মত। কিন্তু সে গেল আরো উঁচু দিয়ে। কাঠি তোলার শেষ মার্কা ১২ ফুট দেওয়া হল। কিন্তু বাবলু এবার একখানা লাফ যা দিল অনেকের চোখে ধাঁধাঁ লেগে গেল। অনেকে দেখতেই পায় নি। সে প্রায় দুতলা অর্থাৎ ২১।২২ ফুট উপর দিয়ে উড়ে গেল। আর পড়ল গিয়ে মাঠের প্রায় কিনারায়।

দিশাদেবী উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "বাঃ! এযে অবিশ্বাস্য লাফ। তোমাকে আমি সোনার মেড্যাল দেব। এসো এখন সকলে আমার বাড়িতে, তৈরি কিছু জলখাবার খাবে।

জলখাবার বলতে তিনি সকলকে দিলেন ঘরে তৈরী ফুচকা, যে যত খেতে পারে। বাবলুকে সকলে কাঁধে করে তুলে ঘুরতে লাগল আর শ্লোগান দিল "থ্রি চিয়ার্স ফর বাবলু!"

একটি স্বর্ণপদক পেল বাবলু। সেই পদকটি বটুকবাবু একদিন প্রোফেসারকে দেখিয়ে বললেন, আমার ছেলের পুরস্কার না' এটি আপনারই পুরস্কার বুঝতে পারছি না।

কিন্তু প্রোফেস্যর তখন যে মাধ্যাকর্ষণের আকর্ষণ এড়িয়ে অন্যজগতে মনঃসংযোগ করেছেন, সে খবর বটুকবাবু আর জানবেন কি করে! একটু পরে প্রোফেসার বলে উঠলেন ওহো সেই অ্যান্টি-গ্র্যাভিটি—আরে ও মেড্যাল ত বাবলুর প্রাপ্য। ওর গলায় পরিয়ে দিন।

আজকের ডাক, স্যার !

কই দেখি—

হাতের ম্যাগাজিনটা ঠেলে রেখে প্রোফেসার বি. ডি. হাত বাড়িয়েছেন রোণ্ডির দিকে।

হ্যাঁ, ইনি সেই প্রোঃ বি. ডি. মানে প্রোঃ বুদ্ধিধর, যিনি বিজ্ঞান নিয়ে সারা জীবন কাটাচ্ছেন। কত যুগান্তকারী আবিষ্কার যে ইনি করেছেন সে কারই বা অজানা আছে ? ওর বিকর্ষণ বটিকা মাধ্যাকর্ষণকে রুখে দাঁড়িয়েছিল। আর সেই যান্ত্রিক ওভার-কোট। সেটি আর কিছু নয়, শীত-গ্রীষ্ম-নিবারক তাপ-নিয়ন্ত্রক একটি জামা, সেবারে দুর্গাপুরে আলোড়ন এনে দিয়েছিল।

চিঠির গোছা থেকে একটা বেছে নিয়ে প্রোফেসার বললেন, এটা তো দেখছি জার্মানীর হফ্‌ম্যান কোম্পানী থেকে। আর এটা হল গিয়ে বুদাপেস্ট থেকে—মনে হয় পল সিপ্রি লিখেছে। এটা—বম্বে থেকে, কে লিখছে দেখি। ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। এই শুয়োরটা ভাবে কি ! আমাকে যা বলবে তাই করতে হবে ? ঢোলকচাঁদ কোম্পানী থেকে কুলকার্ণি লিখছে যান্ত্রিক ওভারকোটের ব্যাপারে ওরা আগ্রহী। ওরা এটাকে পেটেণ্ট করতে চায়। তার মানে ওদের দিয়ে দিতে হবে।

জানি তারপর কি হবে। চড়া দামে ওরা বাজারে ছাড়বে আর লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফা লুটবে। এ সব হবে না বাবা ! সাধারণ লোকের তাতে লাভটা কি ? বিজ্ঞানের এই কি উদ্দেশ্য ?
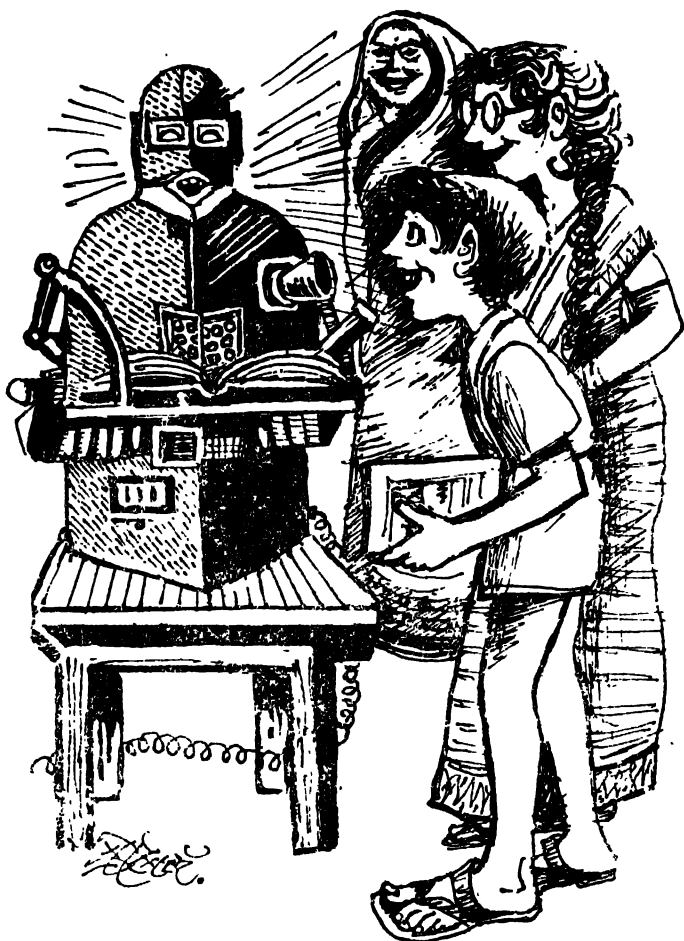
স্যার, এই চিঠিখানা বোধ হয় দুর্গাপুর থেকে—বলে ব্রেণিও একটা থাম এগিয়ে দিল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এত দেখছি, মৌসুমীর হাতের লেখা। মেয়েটা বড্ড ভাল। কি লিখেছে দেখ তো!

ব্রেণিও চিঠি পড়ে বলল, আপনার মাসীমার চোখের ট্রাবল তাছাড়া মৌসুমীর পড়াশোনা ভাল হচ্ছে না—

কেন? কেন? প্রোফেসার বিচলিত হন। বলেন, পড় তো ঐখানটা কি লিখছে—

ব্রোণ্টি পড়তে থাকে—

বুধুদা, ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসের এত গাদা গাদা পড়া যে মাথা ধরে যায়। চোখ টন্ টন্ করে। দেখ দেখি কি মুস্কিল। কত সব নতুন নতুন বই বেরুচ্ছে মাসে মাসে, বিজ্ঞাপন দেখি, লাইব্রেরীতেও আসে। পড়তে এত ইচ্ছে করে কিন্তু সময় কই? বাবা বলেছে তোমার চোখে মাইনাস চশমা, খবরদার অত পড়াটড়া চলবে না বাছা! কি করি বল তো? তারপর লিখছে, আমাদের সেই মুংলি গরুটার বাচ্চা হয়েছে, দুধ যা দিচ্চে না! মা বলেছে, তোর বুধুদা যদি আসে এবার তাকে বাঁধাকপির পায়েস খাওয়াব, প্রণাম রইল—ইতি মৌসুমী—

হুম্! প্রোফেসার বুদ্ধিধর শুধু একটি আওয়াজ তুললেন। তারপর হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, কিছু পেলে ব্রোণ্টি? মানে, পেলে কিছু সাবস্ট্যান্স?

আজ্ঞে, স্যার?

আরে, মোদ্দা কথাটা বুঝলে না? একটা বিরাট সম্ভাবনা? আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের কতখানি প্রকাণ্ড সুযোগ রয়েছে বুঝতে পারলে না?

আজ্ঞে, আপনার মাসীমার চশমার লেন্স নিয়ে নিশ্চয়ই ভাবছেন আপনি, কিংবা মৌসুমীরও হতে পারে।

আরে দূর! ওটা ভাববে অপ্টিসিয়ানরা। বই পড়া হে, বই পড়া! ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মগজে কিছু এল না?

ব্রোণ্টি প্রোফেসারের সহকারী হয়েও কি বলবে ঠিক ভেবে পেল না।

স্যার বললেন, মৌসুমীর প্রব্লেম হল পড়া। ক্লাসের একগাদা বই পড়তে হবে তাছাড়া আরো কত কি পড়বার রয়েছে অথচ বেচারার চোখে মাইনাস লেন্স। পড়া নিষেধ করে দিয়েছে ডাক্তার।

আপনার মাসীমাও তো রামায়ণ পড়তে পান না চোখের জন্যে। ব্রোণ্টি সুযোগ পেয়ে বলে উঠল।

রাইট! তাহলে দাঁড়াচ্ছে কি? পড়াটা আমাদের জীবন থেকে বাদ দেওয়া যায় না, পড়তেই হবে। অথচ পড়তে গেলেই চোখের দরকার। এনার্জি দরকার। সময় দরকার।

হ্যাঁ স্যার! আমার এক ঠাকুমা'র চোখে ছানি. দেখতে পায় না।

তাকে রোজ মহাভারত পড়ে শোনাতে হবে, না শোনালেই চটে আগুন। অথচ লোক পাওয়া যায় না যে পড়বে।

তা তো হবেই, কিন্তু পড়ে দেবার লোকই বা এত পাওয়া যাবে কোথায় বল? আগেকার দিনে পয়সাওলা লোকেরা বুড়ো বয়সে লোক রাখত মাইনে দিয়ে বই পড়ে শোনাবার জন্যে। মোটা মোটা বই তারা ক্রমাগত পড়ে যেত আর তারা তাকিয়া ঠেস দিয়ে আরাম করে শুনত।

আচ্ছা স্যার, টেপ রেকর্ডারকে এ কাজে লাগানো যায় না? ব্রোঞ্চির মাথায় বিজ্ঞান-প্রতিভার একটা স্ফুলিঙ্গ যেন ঝলকে ওঠে।

রাইট ইউ আর। বলছ ঠিকই, তবে এক জায়গায় গোলমাল করে ফেলছ। সাউণ্ডকে রেকর্ড করা তো সহজ কথা। সে তো এডিসন সায়েব করে গেছেন কদ্দিন হল! এ হচ্ছে অন্য জিনিস। ব্যাপারটা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। একটা রে অব লাইট ছাপার হরফের ওপর দিয়ে চলে যাবে আর শব্দগুলোর উচ্চারণ হতে থাকবে—খুব শক্ত জিনিস নয়। ওহে, আজ কম্পিউটারে হিসেবনিকেশ শুধু নয়, চিন্তা-ভাবনা পর্যন্ত ব্রেনের কাজ কত কি করছে বল তো! তার তুলনায় এটা আর এমন কি! তিন বছর আগে এটা নিয়েই কাজ করেছিলাম। মানে, করতে হয়েছিল আমায় এক বই-পাগলা বুড়োর পাল্লায় পড়ে আর কি!

তাই নাকি? ব্রোঞ্চি যেন কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে।

সে মেসিনটা ঐ ৫নং র‍্যাকে তোলা আছে। কিন্তু যার জন্যে এতো করলাম সেই বই-পাগলা বুড়ো এই সুখবরটা পেয়ে এমন খুশি হল যে আদপে টিকলই না। গাদা গাদা বইপত্তর ফেলে রেখে লোকটা বেমালুম পরলোকে পাড়ি জমাল। সেই মেসিনটার কথাই ভাবছি—

কি ভাবছেন, স্যার?

ভাবছি, ঝেড়েমুছে আর একটু উন্নতমান করে নিয়ে যাব দুর্গাপুরে। ওটার নাম দিছলাম অটো-রীডার।

দুর্গাপুরে প্রোফেসারের মেসোমশাই বদলী হয়ে গেছেন। মেসো-মশাইএর নাম রাঘববাবু। দারোগা মানুষ, বিরাট চেহারা, মাথায় বিরাট টাক। সেবার যান্ত্রিক ওভারকোটের দুর্ঘটনার পর অনেক দিন আমার ওপর তিনি চটে ছিলেন। তারপর ভাবলেন, যাই হোক বুধু তো ভাল কাজই করেছিল। আমার দুঃখুটা বোঝে বলেই না অত বড় আবিষ্কার করলে। একটু ভুলের জন্যই তো হল ঐ কাণ্ড! সে আর কোথায় না হচ্ছে—

দিন পনেরো পরে প্রোফেসার বুদ্ধিধর ব্রোঞ্চি সহযোগে ঐ অটো-রীডার যন্ত্রটি প্যাক করে নিয়ে দুর্গাপুরে মাসীমার বাড়ী হাজির।

মাসীমা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। মৌসুমী হঠাৎ প্রোঃ বুদ্ধিধরকে দেখে তো আনন্দে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠেছে। ভোম্বলও এক ছুটে হাজির হয়েছে ওদের সামনে।

এবার কি এনেছ, বুধুদা? চোখ বড় বড় করে দুজনেরই দ্বিমুখী প্রশ্ন।

এবারে এক মজার জিনিস।—প্রোফেসার বললেন। মৌসুমীর চিঠি পেয়েই ত এলুম ছুটে।

আচ্ছা, আন্দাজ করে বল ত ওটা কি?

বলোনা ওটা কি? ভোম্বল ধরে বসল।

ব্রোঞ্চি আর প্রোফেসার ধরাধরি করে তখন গাড়ী থেকে নামাচ্ছিল সেই যন্ত্রটা।

ও মা, এটা আবার কি? মৌসুমী অবাক হয়ে মাকে ডাকে, মা, শীগগির দেখে যাও বুধুদা কি এনেছে। কি একটা ভূতের মত দেখতে—

দাঁড়া, যাচ্ছি, মাছটা চাপিয়ে যাব তো! চোখে আবার ঝাপসা দেখি মাঝে মাঝে—রান্নাঘর থেকে বললেন মাসীমা। এবার ছানি না কাটালে রান্নাবান্নাও বন্ধ।

একটু পরে হাত ধুয়ে এসে বললেন, ও মা, এটা কিরে?

মৌসুমী বলল, বলব আমি? এটা একটা রোবট। রোবটের ছবি দেখেছিলুম ঠিক ঐ রকম দেখতে।

তোকে আর পাকামি করতে হবে না বলে ওঠে ভোম্বল।

বহুৎ আচ্ছা! প্রোফেসার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন,—বাঃ, সুমীর মাথা আছে দেখছি! শোন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, একটা মজা দেখাচ্ছি দেখ। একটা বই নিয়ে আয় দেখি ভোম্বল!

কি বই?

আরে, যে কোন বাংলা বই হলেই হবে।

ভোম্বল এক ছুটে গিয়ে তার ইতিহাসখানা নিয়ে এল।

প্রোফেসার বললেন, এই দ্যাখ, এইখানে এই বইটাকে খুলে আটকে দিলুম। ব্রোঞ্চি, এবার কানেকশানটা করে দাও তো!

কানেকশান করে দেওয়া হল। প্রোঃ একটা নব্ ঘোরাতে লাগলেন। ভেতরে মনে হল আলো জ্বলে উঠেছে।

হঠাৎ স্পীকার থেকে আওয়াজ বেরুল গোঁ গোঁ-গোঁ...ক্রীচ্-চ্ ক্র্যাক্ ক্র্যাক্-ক্...তারপর মনে হল কে যেন কথা বলছে। রেডিওর মত আওয়াজ, কিন্তু স্পষ্ট নয়।

তারপর গলাটা বেশ স্পষ্ট হল। বোঝা গেল কে যেন পড়ছে—বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা জব চার্ণক কর্তৃক স্থাপিত হয়। ইনি একজন সদাগর ছিলেন। সেই কলিকাতা ভারতের রাজধানী হইল, তারপর অবশ্য...

ভোম্বল চীৎকার করে ওঠে, আমার বইটা পড়ে দিচ্ছে। বা-রে, বেশ মজার কল তো! কী সুবিধা হবে এবার।

মৌসুমী বললে, বুধুদা, আমার বইটা যদি দিই?

দে না। ইংরেজি হলে অবশ্যি নবটা অন্যভাবে ঘোরাতে হবে।

মাসীমা বললেন, হ্যাঁ রে, এ যে বই পড়া কল মনে হচ্ছে রে! কালে কালে কতই হল বাবা! এ কি তুই বানিয়েছিস বুধু?

আর কে বানাবে মাসীমা? তোমার পড়তে কষ্ট হয় বলেই তো। এবার প্রাণ ভরে তুমি রামায়ণ-মহাভারত শোন না কেন! চোখ বুজে শোন। কষ্ট করে আর পড়বার দরকারই নেই।

বলিস কি রে! মাসীমা গদগদ হয়ে ওঠেন। আমার চোখ করকর করে বলেই তো পড়তে পারিনা বাবা। মেয়েকে বলি একটু পড়ে দে। মেয়ের সময় হয় না। মার জন্যে কত না দরদ!

বা-রে! মৌসুমী সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে,—আমার পড়া নেই বুঝি? কলেজের বই শেষ করে একটা উপন্যাস পড়ব তাই সময় পাই না। আর বাবা তো আমায় পড়তে বারণই করে দিয়েছে। আমার কি দোষ বুধুদা? আমি কি সব ছেড়ে মার রামায়ণ পড়তে বসব।

তোদের জন্যেই তো ভেবে ভেবে এইটা বানিয়েছি। এবার সবাই খুশি তো? বললেন প্রোফেসার। আশ্চর্য, বিজ্ঞানের যুগে মানুষ যে কেন এত কষ্ট করে মরে! চোখের ট্রাবল জানি, কিন্তু কান ত আছে।

ভোম্বল ইতিমধ্যে একগাদা বই এনে হাজির করেছে। তাতে আছে বিশালগড়ের দুঃশাসন, গালিভার্স ট্র্যাভলস, ঠাকুমার ঝুলি, হ য ব র ল ইত্যাদি আরো কত কি!

প্রোঃ বুদ্ধিধর বললেন, জিনিসটা চালানো শিখে নে। কেমন? এবার

যার যখন যেটা পড়ার দরকার সেটা চাপিয়ে শুনবি। তবে বলে রাখছি, ইংরেজি, হিন্দী বা অন্য ভাযা হলে চলবে না। বাংলা হওয়া চাই কিন্তু। মনে থাকে যেন।' অনা ভাষার জন্য অন্য ব্যবস্থা। হ্যাঁ, আমরা এখনই কিন্তু চলে যাব, মাসীমা!

কেন রে? মাসীমা বাধা দেন। না, না, আজকে থেকে যা। তোর মেসোর সঙ্গে দেখা করবি তো? তাঁর ফিরতে সন্ধ্যে হবে।

না মাসীমা, উপায় নেই। আমাদের ফিরতেই হবে। অনেক কাজ।

মৌসুমী ছুটে এসে বলল, এটার নাম কি বুধুদা? লোকে জিগ্যেস করলে একটা বলতে হবে ত।

বুধুদা চুরুটটা মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, বলবি, এর নাম অটো-রীডার।

প্রোফেসার চলে আসার পর মৌসুমী আর ভোম্বলের আর কাজকর্ম নেই, কেবল অটো-রীডারের কাছে বসে আছে। এটা সেটা নানা বই পড়িয়ে নিচ্ছে কলে চাপিয়ে।

দুপুরে কাজকর্ম সেরে মাসীমা বললেন, দেখি তোরা সর তো, এতক্ষণ ত মজা করলি, এখন আমার বই পড়াবো। রামায়ণখানা চাপা তো, একটু শুনি আরাম করে।

রামায়ণ পড়া হতে লাগল। মাসীমা তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুনছেন। চোখ বুজে আসছে। একটু পরেই নাক ডাকছে।

রাঘববাবু বাড়ীতে এসে অবাক। কার যেন গলা পাচ্ছি! কিগো তুমি ঘুমুচ্ছ কেন?

এ নতুন গলাটা কার? চেনা নয় তো—ঘরে ঢুকে দেখেন লোক ভর্তি। পাড়ার অনেকে এসে জমে গেছে। ছেলে বুড়ো কেউ বাদ নেই। মাঝখানে একটা রোবটের মত অদ্ভুত যন্ত্র থেকে শব্দ বেরুচ্ছে। তখনও রামায়ণ পাঠ চলছে।

সব শুনে রাঘববাবু বললেন, নাহ্ বুদ্ধিধর সত্যিই একটা জিনিয়াস! যাক এ্যাদ্দিন পরে আমার রবীন্দ্র রচনাবলীর একটা কুলকিনারা হবে। কেনার পর থেকে ঐ আলমারীর বাহার হয়ে আছে।

ভোম্বল বলল, আমার পড়ার সময় কিন্তু রীডারকে আমি ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।

বা-রে, মৌসুমী ফোঁস করে উঠল, আমার বুঝি পড়া নেই? আমার

পৌরবিজ্ঞান, অর্থবিদ্যা বইগুলো দেখেছিস কি রকম মোটা মোটা বই, সব দেখিস নি বুঝি ?

মাসীমা হেঁকে বললেন পাশের ঘর থেকে, আমি বলে রাখছি দুপুরে কিন্তু ও আর কারুর নয়। ও শুধু আমার রামায়ণ পড়বে।

, মেসোমশাই খাঁকি পোষাক পরতে পরতে বললেন, শোনো, সারাদিন তোমরা ওকে কাজে লাগাতে পার কিন্তু থানা থেকে ফিরে এলে ও আমাকে রবীন্দ্র-রচনাবলী শোনাবে, এই বলে রাখলুম।

এদিকে প্রোঃ বুদ্ধিধরের কাছে নানান লোকের আনাগোনা। বিখ্যাত-জায়াণ্ট পাবলিশার্স-এর মালিক মিঃ তোতারাম ক'দিন থেকে ধর্ণা দিচ্ছেন প্রোফেসারের কাছে।

তিনি বললেন, প্রোফেসার সাব, ঐ মেসিনটা সম্বন্ধে যা শুনিয়েসি তাতে হামি তাজ্জব হইয়েসি। ওটা হামারে বেচিয়ে দিন। কোতো লাগবে বলিয়ে ?

কোন মেশিনের কথা বলছেন ? বুদ্ধিধরের প্রশ্ন।

ঐ যে বই পড়া হইয়ে যায়, কি নাম আসে উয়োর— ?

অটো-রীডার।

হাঁ হাঁ, অটো-রীডার। নাম ভি বহুৎ বঢ়িয়া হ্যায়।

আপনি রীডার মেশিন কি করবেন ? আপনি তো বই ছাপেন ?

জি হাঁ। আরে মোসাই, হামি বই বিক্রী করবে আউর মেসিন ভি বিক্রী করবে। শোচিয়ে কি, যো কিতাব কিনেগা সেই মেশিন ভি লে লেগা। আউর শোচিয়ে, সেশিন মে জলদি পাঠ হো যায় কি বইকো কিতনা ডিম্যাণ্ড হোগা ! কমসে কম হাম দশ বিশ লাখ কপি বিক্রী করনে সেকেগা।

হুঁম ! আচ্ছা—প্রোফেসার চিন্তিত হয়েই বললেন, ব্যাপারটা আমি একটু ভেবে দেখি, তারপর আপনাকে জানাব। কেমন ?

এই বলে প্রোফেসার তোতারামকে বিদায় দিলেন।

সাতদিন পরে আমি আর বটুকদা প্রোফেসারের বাড়ি গেছি। বটুকদার কাছে সব শুনে আমারও যৎপরোনাস্তি আগ্রহ জিনিসটা স্বচক্ষে পরখ করার। তা ছাড়া কাগজে পড়েছি, "দুর্গাপুরে যুগান্তকারী

আবিষ্কার। লেখক যত ইচ্ছা মোটাসোটা বই লিখতে পারেন, রীডিং মেশিন অবলীলাক্রমে তা পড়ে দেবে। পাঠক এবার শ্রোতার ভূমিকায়, ইত্যাদি ইত্যাদি।''

বটুকদা বললেন, প্রোফেসার, দুর্গাপুরের খবর-কাগজে পড়ে মনে হল এ নিশ্চয়ই আপনার আবিষ্কার। তাই এলুম দেখতে। কথাময়বাবুও এলেন আমার সঙ্গে।

প্রোফেসারের হাতে ছিল একটা চিঠি। উত্তেজিতভাবে পায়চারি করছিলেন তিনি। হঠাৎ চড়া গলায় হাঁক দিলেন, ব্রোণ্ডি!

কি স্যার?

শোনো, আমায় আর সাতদিন কেউ না ডিস্টার্ব করে। আর তুমি এই চিঠিটা পড়ে এঁদের শুনিয়ে দাও।

বলেই উনি একটা সিগার তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

বটুকদা বললেন, মিঃ ব্রোণ্ডি, স্যার আজ এত উত্তেজিত কেন? আমরা কি কোন অপরাধ করলুম নাকি?

না, ব্রোণ্ডি বলল।—মানে, এই চিঠিটা পেয়েই ওঁর মেজাজটা ঠিক নেই। হুকুম যখন হয়েছে এখন চিঠিটা শুনিয়ে দিই আপনাদের। চিঠিটা লিখেছে মৌসুমী। স্যারের মাস্তুতো বোন। পড়ছি শুনুন—

বুধুদা, তোমাকে এই চিঠিটা লিখতে যে কি খারাপ লাগছে তা আর কি বলব! তোমার অটো-রীডারের কথা ভাবলেই আমার কান্না পায়। ব্যাপারটা যা ঘটেছিল সংক্ষেপে বলছি।

বাবা সবার কাছে খুব অটোর গল্প করেন, আর সকলে অবাক হয়ে যায়। আমাদের বাড়ীতে দলে দলে লোক আসে। একদিন বাবা বললেন, আমাদের একটা ফাংশান হচ্ছে লাইব্রেরী হলে। সেখানে গান আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি হবে। আমি ভাবছি কি জানিস, এক কাজ করব। ঐখানে ঐ অটো-রীডার বসিয়ে সকলকে অবাক করে দেব। আমাদের উপরওয়ালা কমিশনার সায়েব আসবেন। এমন কি হোম মিনিস্টারেরও আসবার কথা আছে। তাঁদের কাছে এটা একটা বিরাট সারপ্রাইজ হবে।

আমরা বললুম, খুব মজা হবে। পরিকল্পনা মত সব ঠিকঠাক হল। লাইব্রেরী হলে তিল ধারণের জায়গা নেই। লোক গম্‌গম্‌ করছে।

মিনিস্টারও এসেছেন। উদ্বোধন সংগীত গাইল সুমিত্রাদি। তারপর বাবা একটা ভূমিকা করে বললেন, আজ আপনাদের একটা নতুন জিনিস দেখাব। কে বলে বাঙালীর উদ্ভাবনী শক্তি নেই? এই কাপড়ঢাকা যে বস্তুটি রয়েছে তার গুণাগুণ আপনারা এখনই দেখবেন এবং শুনবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিনন্দন পত্র আমি পড়ব না, এই যন্ত্রটিই পড়বে। এই বলে তিনি কাপড়ের ঢাকা খুলতেই দেখা গেল অটোকে।

হলের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। বাবা অভিনন্দন পত্রটি অটোর হাতে এঁটে দিয়ে ভোম্বলকে বলবেন, নাও, বাবা ভোম্বল, এইবার প্লাগটা লাগিয়ে এটা চালিয়ে দাও।

ভোম্বল তার বিদ্যা কাজে লাগাল। কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ কিছুই বেরুল না। ঘর স্তব্ধ, একটা পিন পড়লে তার শব্দ শোনা যায়।

কি হল? বাবা একটু অস্থির হয়ে উঠলেন।

ভোম্বল আবার একটু কি কারিকুরি করল, যার ফলে অটোর স্পীকার থেকে অদ্ভুত আওয়াজ বেরুতে লাগল।

কিঁচ-কিঁচ···অ্যাঁও-ও-ও হুই-ই-ই-ই-ই—

ভোম্বল আর এক প্রস্থ হাত লাগাতেই হঠাৎ অভিনন্দন পত্রটা ছিটকে পড়ল আর পরিষ্কার কথা বেরুতে লাগল।

কথাগুলো অনেকটা এই রকম ঃ

—বাবরের পুত্র হুমায়ুন···বিষুবরেখার অন্তর্গত অত্যুষ্ণমণ্ডল কর্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর অনীয় প্রত্যয় হয়—গৌ গাবৌ গাবঃ, গাম্-গাবৌ গাঃ, গবা গোভ্যাম্ গোভিঃ—

ছেলেমেয়েরা খুব হাসছে। আর ও বলে যাচ্ছে—গজঃ গজৌ গজাঃ —অর্থনীতিতে মূল্য চাহিদা ও জোগানের অনুপাতে—উৎপাদক হ্রাস পাইলে মুদ্রাস্ফীতি হয় এবং কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান, শুনে পুণ্যবান, শুনে পুণ্যবান—

হলের মধ্যে চীৎকার উঠল। কেউ বললে, আবোল তাবোল বন্ধ করা হোক! মিনিস্টার হাসতে হাসতে বললেন, এটা কি রাঘববাবুর রসিকতা?

অটো বলে যাচ্ছে ঃ দুর্নীতি—দুর্নীতির দায়ে হাতিমারায় দারোগা—দারোগা—দারোগা গ্রেপ্তার—

এবার পুলিশ কমিশনার অগ্নিমূর্তি হয়ে বলে উঠলেন, শাট্ আপ্ ! হ্যাঁ, গ্রেপ্তারই করা উচিত এই রাঘববাবুকে।

বাবা ছুটে ডায়াসে উঠে অটোকে ধরে এমন এক হ্যাঁচকা মারলেন যে সে কাৎ হয়ে পড়ল আর তার মুখগহ্বর থেকে ঝর ঝর করে কতকগুলো কাগজের টুকরো পড়ে গেল। তার মধ্যে ছিল বইএর ছেঁড়া পাতা আর ছেঁড়া খবরের কাগজের টুকরো।

পরমুহূর্তে একটা বিকট আর্তনাদ ছেড়ে অটো ফেটে চৌচির। দু'-একটা পার্টস যে ছিটকে এদিক ওদিক গেল না তা নয় !

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। মিনিস্টার মশাই সামনেই ছিলেন তো, তিনি হঠাৎ উফ্ বলে লাফিয়ে উঠলেন। দেখা গেল তাঁর নাক থেকে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে। তিনি তাড়াতাড়ি নাকে রুমাল চাপা দিলেন, একপাল পুলিশ এসে পড়ল। হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড !

মুটের মাথায় তুলে জীপে করে অটোকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার কি দশা হয়েছে জানি না। এদিকে বাবার নাকি চাকরি নিয়ে টানাটানি !

আমার কিন্তু মনে হয়, বুধুদা, সত্যিই অটোর দোষ নেই। কিন্তু কেন এ রকম হল বুঝতে পারছি না। তুমি যদি একবার আসতে তাহলেই খুব ভাল হত। ওটা সেরে দিতে পারতে। তোমার ওপর কিন্তু এখন এখানকার সবাই খুব রেগে আছে। প্রণাম নিও। ইতি—

মৌসুমী।

ব্রোণ্টি আসতে বটুকদা বললেন, আচ্ছা, কেন এমন হল বলুন তো ?

ব্রোণ্টি বলল, ব্যাপারটা আর কিছু নয় ; অভিনন্দন পত্রটা হাতে লেখা ছিল কিনা। আর লেখাটাও কাঁচা হাতের। অটো যে হাতের লেখা পড়ে না এই কথাটাই স্যার ওদের বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, বই ধরার ক্লাচটা একটু ডিফেকটিভ ছিল, তাই হয়তো মাঝে মাঝে বইএর পাতার কিছুটা করে ছিঁড়ে টুকরোগুলো গিলে ফেলত অটো !

প্রোফেসার সায়েব এখন ওটা নিয়ে কিছু করবেন নাকি ?

জিজ্ঞেস করলুম আমি।

ক্ষেপেছেন! ওটায় আর চিন্তি নেই স্যারের। এখন একোয়েরিয়ামে মাছ দেখছেন শুধু বসে বসে।

মাছ!—বটুকদা চোখ বড় বড় করে প্রশ্ন করেন।

হ্যাঁ, মানে, মাছের খাদ্য নিয়ে নাকি মাথা ঘামাচ্ছেন। গাপ্পির মত ক্ষুদে মাছকে বৈজ্ঞানিক খাদ্য দিয়ে কেন দেড় দু'হাত লম্বা কাৎলা মাছের মত বৃহৎ করা যাবে না তাই নিয়েই এখন ওঁর যত চিন্তা।

হ্যাঁ, প্রোফেসার বুদ্ধিধরের কথাই বলছি।

অনেকদিন ইনি খবরের জগতে নামবার ফুরসুৎ পাননি। না, তাও ঠিক নয়। ইচ্ছে করেই নামেননি। আত্মগোপন করে ঘাপটি মেরে আছেন। কিন্তু কেন?

বটুকদা হলেন এঁর প্রতিবেশী, তাই কিছু কিছু খবর রাখেন।

বটুকদা বললেন, ইনি একজন খাঁটি বিজ্ঞানী। জিনিয়াসও বলা যায়। বিজ্ঞানীরা কি নাম জাহির করার জন্যে রিপোর্টার খুঁজে বেড়ায়? কক্ষনো না। সেবার ওঁর যুগান্তকারী বিকর্ষণ বটিকা উদ্ভাবনের পর রিপোর্টাররা দলে দলে হানা দিয়েছিল ওর বাড়িতে। প্রোফেসার বুদ্ধিধর ওদের কাছে ধরা দিতে নারাজ। ক্যামেরা নিয়ে তারা বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরতে থাকে। হঠাৎ দরজা খোলা পেয়েই ঢুকে পড়বে এই মতলব।

তারপর? কুতূহলী প্রশ্ন আমার।

তারপর এক ফাঁকে দরজা খোলা পেতেই তারা সত্যিই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরে। তারা ভাবল, এইবার আর যায় কোথা। প্রোফেসারকে পাকড়াও করবই। ক্যামেরা রেডি করে তারা অপেক্ষা করতে থাকে।

বিরিঞ্চি ওরফে ব্রাঞ্চির কাছে খবর পেয়েই উনি চটে গেলেন। একি

অত্যাচার ! বাড়ি চড়াও হয়ে আমার ছবি তুলবে ? ছিঃ, ছবির জন্যে এ লোলুপতা কেন ?

অ্যাসিস্ট্যান্টকে বললেন, ব্রোণ্টি, ওদের ভাগাও ।

কি করব স্যার । ওদের অপমানিত করা কি ঠিক হবে ?

আহা, কি আশ্চর্য ! অপমান করবে কেন ? ওঁরা হাসতে হাসতে বাড়ি চলে যান না।

বুঝলুম না স্যার।

তোমার কাঁচা বুদ্ধিটা কবে যে পাকবে, ব্রোঞ্চ—শোনো, ঐ প্ল্যান্ট থেকে লাফিং গ্যাস ছেড়ে দাও ঐ ঘরে। দেখ কি ব্যাপারটা ঘটে।

তাই হল। হাসতে হাসতে রিপোর্টাররা ফিরে গেল। তারপর আর তারা হামলা করেছে বলে শুনিনি।

আমি বললুম, বটুকদা, আমি যে প্রোফেসারকে নিয়ে গল্প লিখছি। মানে মাঝেমধ্যে লিখে থাকি এটা যেন তাঁর কাছে ফাঁস করবেন না। তাহলে আর আমার নিস্তার নেই। আমার জন্যে তখন লাফিং গ্যাসের বদলে কাঁদুনে গ্যাস ছেড়ে কাঁদিয়ে ছাড়বেন।

চলুন, একবার দেখা করতে চাই ওঁর সঙ্গে।

চল, বটুকদা বললেন, তবে হিসেব করে যেতে হবে। দেখা করার সময় হচ্ছে ৩-৩০ মিঃ। তাহলে এখুনি যেতে হয়।

বাড়িতে ঢুকে দেখা গেল ওঁর কামরার দরজা বন্ধ। পাশে লেখা রয়েছে তিনবারের বেশি টোকা দেওয়া চলবে না।

তিনবার টোকা মেরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় দেখি তিনজন অবাঙ্গালী ভদ্রলোক এসে হাজির। তাঁরাও দেখা করতে চান।

হঠাৎ দরজার ফাঁকে একখানা মুখ দেখা গেল। গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে পোঁতা একটা ধূমায়িত চুরুট, চোখে পুরু কাচের চশমা।

আসুন।

সবাই ভিতরে গিয়ে বসলুম।

প্রোফেসার বুদ্ধিধর নাকের ডগা থেকে চশমাটা খুলে আর একটা চশমার কাচ মুছতে লাগলেন। তারপর সেটা দুকানে লাগিয়ে বললেন, এবার বলুন, কি দরকার। বটুকবাবু ত পাড়ার লোক তোমার সঙ্গে কথা পরে হবে।

হামাদের একটু কথা ছিল সার। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললেন।

কি বলুন।

আপুনি যে দুধ তৈরির একটা কল বানিয়েসেন, গরু লাগবে না কুছু লাগবে না। সেইটা হামারে বেচিয়ে দিন।

ও, সেই ফর্মুলাটা। ও ত গত বছরের কথা। হঁা, চালের কুঁড়ো থেকে লিটার লিটার দুধ হতে পারে। মাখন ঘি, সব হতে পারে।

হঁা, হঁা, ঐটার কথাই বলছি।

আরে মশাই, ওটা হবে না।

কেন, বলুন ত ?

চাল কোথা যে কুঁড়ো পাবেন। চাল তৈরি নিয়ে কাজ করতে হবে তারপর ওসব হবে। এবার আপনারা বলুন।

একজন শুরু করলেন, আপনি সার, পাথর থেকে কাঠ বানিয়েসেন। এ বড় জবর জিনিস মোশাই।

হ্যাঁ, কাঠ থেকে ফসিল হচ্ছে ত, ফসিল ত একরকম পাথর। তা যদি হয় তাহলে পাথর থেকে উল্টো দিকে গেলে কাঠ হবেনা কেন।

হঁা, উ যদি হইয়ে যায় তাহলে দেওঘরের ত্রিকুট পাহাড়টা হামি কিনিয়ে লিব। উইখানে টিম্বার বানাবার ফ্যাক্টরী বসিয়ে দিব। ভাবুন হামাদের দেশে কত পাহাড় ফালতু দাঁড়িয়ে আছে—

তা ত আছে। প্রোফেসার একটু বিরক্ত হয়েই বললেন, কিন্তু ও জিনিস অনেক পুরনো। দেড় বছর আগে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলুম। আমি বুঝতে পাচ্ছি না এ সব খবর লিক করে কি করে ? আপনি শুনলেন কোথা থেকে ?

শুনা যায় মোসাই, এ রকম বড় খবর কি চাপা থাকে ?

ঘাড় দেখে প্রোফেসার একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন, ওটা এখন হবে না। আমি এখন অন্য কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি—আপনি ছ'মাস পরে আসবেন। দেখা যাবে।

আচ্ছা। তাই আসব, মনে রাখবেন স্যার। নমস্তে।

ওঁরা তিনজন চলে গেল।

আমাকে দেখিয়ে কটুকটা বললেন, ইনি কথাময়বাবু গল্প-টল্প লেখেন। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

গল্প ? হো হো করে হেসে উঠলেন প্রোফেসার। লেখা গল্প, যা পড়তে হয় ?

হ্যাঁ, লেখা গল্প। পড়বার জন্যে পড়ে শোনাও যেতে পারে, বললুম আমি।

প্রোফেসার হঠাৎ হাক্ দিলেন, ব্রোঞ্চি। তিন কাপ কফি পাঠিয়ে

দিও হে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি একবার ভেবেছিলুম লিকুইড গল্প করব, শিশিতে থাকবে! এক ফোঁটা খেলে একটা গল্প মনে আসবে—

সে আবার কি? বটুকদা অবাক হন।

ব্যাপারটা জটিল। বুঝলে হে বটুক, তবে বিজ্ঞানের কাছে কি-ই বা শক্ত থাকছে বল। মানুষ শুধু বোকার মত কষ্ট করে মরছে।

আমি বললুম, এখন কি করবেন আপনি?

আরে মশাই, আজই ত যাচ্ছি দুর্গাপুরে। সেখানে এক মেসোমশাই থাকেন। দারোগা। ইছাপুর থেকে বদলি হয়েছেন দুর্গাপুরে। মোটা মানুষ। এই বোশেখী গরমে কী কষ্টই না পান। দুপুরে রোদ্দের মধ্যে ঘুরতে হয় ত। তাই ভাবতে ভাবতে একটা উপায় বার করেছি। এবার আর কোনো দুঃখু থাকবে না তাঁর।

কি রকম একটু শুনি না। বটুকদা বলে ওঠেন।

এই সময় ভৃত্য এসে তিন কাপ কফি দিয়ে গেল। আর ব্রোণ্ড এসে বলল, আমাদের জিনিসপত্র কি কি নিতে হবে, স্যার?

কেন? লিস্ট দিইনি?

কই না স্যার।

কোথায় রাখলুম তবে। দেখত আমার ব্যাগে আছে কি না। আর দেখো রিজারভেশন টিকিটগুলো হারায় না যেন। তোমার যা খেয়াল কম। বিজ্ঞান সাধনা কি সোজা জিনিস হে। চারদিকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে—হ্যাঁ। কি বলছিলুম? দেখছেন ত সময় নিয়েই আমার টানাটানি—

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, আচ্ছা হে বটুক, এঁকে নিয়ে এস আবার। দিন দশেক পরেই আমরা ফিরে আসছি।

আমরাও উঠলুম।

দশদিন কেটে গেছে। এগারোদিনের দিন বটুকদাকে নিয়ে আবার গেছি প্রোফেসারের বাড়ি।

তিনবার টোকা মারবার পর দরজা খুলল। কিন্তু ফাঁক দিয়ে যে মুখ দেখা গেল তাতে দাড়ি গোঁফ নেই। পাতলা চোয়াড়ে মুখ, প্রোফেসারের সহচর ব্রোণ্ড।

ভেতরে ঢুকে আমরা বসলাম।

স্যারের সঙ্গে ত আজ দেখা হবে না। ব্রোঙ্গু বলল।

কেন?

অসুস্থ।

কি হয়েছে?

দুর্গাপুরে একটা কাণ্ড হয়েছিল, তাতেই—

কি হয়েছিল বলুন না শুনি, বললাম আমি।

বলছি। তাহলে গোড়া থেকেই বলি। স্যারের মেসোমশাই বেশ মোটা-সোটা মানুষ। রোদ্দুরে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গলদঘর্ম হয়ে যান! তাই দেখে স্যার মাথা খাটিয়ে একটা আবিস্কার করলেন অদ্ভুত ওভার-কোট যা পরলে গরম লাগবে না। দিব্যি আরামে চলাফেরা করা যাবে। মনে হবে যেন ঠাণ্ডা দেশে বেড়াচ্ছ।

বাঃ, বেশ মজা ত!

সেই ওভারকোট আর তার আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে আমরা ত গেলাম দুর্গাপুর। সেখানে পেঁছে মেসোমশাইকে ঐটি দিয়ে স্যার বললেন, আপনার কষ্টের অবসান হল এবার। নিন পরে ফেলুন এটা, দেখি আপনার গায়ে ফিট করে কি না।

মেসো ত ওটি দেখে চমকে উঠেছেন। বললেন, বলিস কিরে? এটা কি পরবার বস্তু নাকি? আমি ত ভেবেছিলাম একটা হোল্ডল!

হ্যাঁ তাও বলতে পারেন। দেহ বাঁধার হোল্ডল হল আর কি।

স্যার হেসে বললেন, অনেক জিনিস আছে যাকে দেখায় অন্য জিনিসের মত। যেমন একটা রকেটকে দেখায় মোচার মত। আসলে এর মধ্যে অনেক যন্ত্রাদি বসাতে হয়েছে ত তাই একটু চেহারাটা অদ্ভুত লাগছে!

এটা পরলে কি হবে রে? ব্যাপার খুলে বল ত, বাবা। মাসীমা বলে ওঠেন?

এটা পরলে শীতকে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মকে শীত করা যাবে। অর্থাৎ ধানবাদের পিচ-গলা দুপুরে তুমি এটি পরে বেড়াও তোমার মনে হবে যেন বসন্তকাল। আবার এটি পরে দার্জিলিংএ শীতকালে বেড়াও তোমার মনে হবে কোথায় শীত? শুধু এই বোতামগুলো ঘোরাতে হবে প্লাস মাইনাস হিসেব করে। এই ভারী বাক্সর মত জিনিসটা স্ট্র্যাপ দিয়ে কাঁধে ঝোলাতে হবে। এর মধ্যে ব্যাটারী মোটর আরও সব অনেক কিছু আছে।

মেসোমশাই বললেন, এযে এয়ার-কণ্ডিশানের মত শোনাচ্ছে হে !

মাসীমা বললেন, তাহলে ত মানুষের শীত গ্রীষ্মের কষ্টই থাকবে না রে। তা যদি করতে পারিস বাবা তা হলে একটা মস্ত কাজ হয়। দেখনা ঠাণ্ডার জন্যে আমার ফুলুমানালি যাওয়া হল না।

মৌসুমী আর ভোম্বল এতক্ষণ শুনছিল। এবার তারা বলে উঠল, মা আমরাও পরব। যা গরম লাগে না দুপুরবেলা। দর দর করে ঘাম ছোটে।

মাসীমা বললেন, থাম, বুধুর মাথা খাটানো জিনিস আমি একবার পরীক্ষা করব। উঃ, গরমে সেদ্ধ হয়ে যাই আর ঘামাচিতে মরে যাচ্ছি রে !

মেসো বাধা দিলেন, তুমি ঘরে আছ আরামে আছ, মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে। তুমি বুঝবে কি গরমের ঠ্যালা কি রকম।

মাসীমা বললেন, তাই ত! তোমার থানায় বুঝি ফ্যান নেই? কারেণ্ট যদি বন্ধ হয় সিপাইদের দিয়ে পাখা টানিয়ে হাওয়া খাও না? কে কত আরামে আছে তা জানতে আর আমার বাকী নেই।

স্যার বললেন, দেখুন মাসীমা, এটা ত ব্যাটা ছেলেদের কোট, এটা ত মেসোমশাইয়ের জন্যে এনেছি উনিই পরুন। তোমাকে অন্য ডিজাইন একটা বানিয়ে দেব।

ভোম্বল বলল, আর আমার ?

মৌসুমী বলল, গরমে আইঢাই করতে করতে আমার লেখাপড়া বন্ধ করতে হয়। আমার একটা চাই কিন্তু বুধুদা। এই বলে রাখলুম কিন্তু।

আমি কি একটা ফ্যাক্টরি খুলেছি র‍্যা! হবে পরে। আমি ত আর পালিয়ে যাচ্ছি না, বললেন প্রোফেসার।

মেসোমশাই এতক্ষণ পরে জিনিসটা হাতে নিলেন। নিয়েই বললেন, ও বাব্বা, এত্তো ভারী। এ পরে যে নট নড়নচড়ন হতে হবে রে। ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হবে যে—

মাসীমা বললেন, আর বলো না, যে ধোকড় ধোকড় জামা পর তুমি। তোমার কাছে ও আর এমন কি গা?

মেসোমশাই ওভারকোটটা হাতে নিয়েছেন। দোলায়িতচিত্তে ভাবছেন পরবেন কিনা এমন সময় একটা জিপ্ এসে দাঁড়াল।

একজন সিপাই বলল, বাবুজী, আপনাকে আবভি থানামে যানে হোগা, একঠো কেস হ্যায়।

তাই নাকি? মেসোমশাই বললেন, যত ঝামেলা। যা চাকরি করি, ফুরসৎ বলে কিছু নেই। যেতেই হবে। আচ্ছা, বুদ্ধিধর, তোমার জামাটা ওখানেই পরব। বোতামগুলোর ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে দাও ত।

স্যার বললেন, এমন কিছুই না, ঐ বাক্সের বোতামটা প্লাসের দিকে ঘোরালে টেম্পারেচার বাড়বে। আর মাইনাসে দিলে কমবে—এই আর কি। এইটুকু মনে রাখবেন।

মেসোমশাই জিপ নিয়ে চলে গেলেন। আমরা দিব্যি গরম গরম পকোড়া আর জিলিপি দিয়ে প্রাভাতিক জলযোগ সারলাম।

বেলা একটায় খাওয়া-দাওয়ার পর আমাদের খোস গল্প হচ্ছে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে সাইকেলে করে এক সিপাই এসে হাজির। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বাবু আপনারে বোলায়েসেন। বাবু জমিয়ে গিয়েসেন।

কি হয়েছে?

সাহাব জ্যাম হইয়েসেন। নিকাল হোনে নেই সেকতা। বহুৎ ঝামেল্যা হইয়েসে। জলদি চলিয়ে।

মাসীমা চিন্তিত হয়ে বললেন, কি হয়েছেরে? নিকাল নেই সেকতা কিরে? বাবুর কোনো বিপদ হল নাকি? এই এক পুলিশের কাজ বাপু, কখন কি হয়, সবখন আমি যেন শিঁটিয়ে আছি।

সদলবলে আমরা গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত অবস্থা। মেসোমশাই একটা টিনের ড্রামের মধ্যে আকণ্ঠ ডোবা বসে আছেন—মাথাটি শুধু জেগে। ড্রামের জল গলা অবধি জমে বরফ। লোকজনও চারদিকে জমজমাট। সবাই ভিড় করে দেখছে। কাঠফাটা গরমের মধ্যে এরকম হল কি করে? সবারই চোখে মুখে সেই রহস্য।

আমাদের দেখেই তিনি চীৎকার করে গালাগালি শুরু করলেন, স্টুপিড নচ্ছার বাঁদর প্ল্যাটিপাস উটপাখি কোথাকার! আমার কি দুর্দশা করেছিস দেখ···গর্দভ জানোয়ার চেয়ে দেখ—

মাসীমা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলেন, ওমা, একি হলো গো তোমার! তুমি যে কুলপিবরফ হয়ে গেলে।

ভোম্বল কিন্তু খুশি মনে বরফে হাত বোলাচ্ছে, আর বলছে। বাপির খুব মজা! বরফের মধ্যে বসে আছে, আহ! দিব্যি আরাম।

মৌসুমী বলল, আয় ভোমা, আমরা আইসক্রীম বানিয়ে খাই—ইশ্ কী ঠাণ্ডা রে !

ওরে বুধু। মাসীমা ডুকরে ওঠেন। এযে হিম হয়ে গেল রে। তোর মেসোকে আগে উদ্ধার কর। আর এই সিপাইগুলোর কি মাথায় কিছু নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে।

একজন সিপাই বললে, বাবুকা এইসন হোয়েসে কি হামরা ত তাজ্জব হইয়ে গিয়েসি। এতনা বরফ ত মিলতা নেই হিয়া।

এরকম হলো কি করে হে ? আমি জিগ্যেস করি।

সে বললে, কেয়া মালুম। বাবু একঠো ধোক্ড়া কুর্তা পিনকে লাগা। উসমে চাবি ঘুরা দিয়া। তব মালুম হুয়া কি বহুৎ গরমি লাগা। বাবু লাফ ঝাঁপ লাগা দিয়া। আউর মেজাজ এইসন চড় গিয়া কি মেরা বদনমে এক ঘুঁষি লাগা দিয়া। বাপ্ রে বাপ! লক-আপ মে কয়েদী ভি হসনে লাগা।

তব্ ক্যা হুয়া ? ব্রোণ্ডির প্রশ্ন।

এক ড্রামমে পানি থা। বাবু উসমে ঘুসা গিয়া। তব দেখিয়ে। থোড়া বাদ উসিকা পানি জমকে বরফ হো গয়া। এ কেয়া তাজ্জব। আরে বাপ!

মেসোমশায়ের তখন করুন কণ্ঠ। ওরে বুধু, তোর বিজ্ঞান আমায় শেষ করলেরে ! আর বোধ হয় বাঁচব না—আমি জমে কুলপি হয়ে গেলুম রে…তোরা কেটে কেটে আমায় খেয়ে ফ্যাল।

কিছু ভয় নেই, বলে স্যার ছেনি হাতুড়ি দিয়ে বরফ কেটে মেসোকে ড্রামস্থ বরফ থেকে উদ্ধার করলেন। ওহ্ সেকি কাণ্ড মশাই।

কেন এরকম হলো বলুন ত ? বটুকদা প্রশ্ন করেন।

ব্যাপারটা অবশ্যি পরে জানা গেল। হয়েছিল কি, উনি কোট পরে চাবি ঠিকই ঘুরিয়েছিলেন। আর তাইতেই হল বিপত্তি। ঠাণ্ডা না'হয়ে উত্তাপ বেড়ে গেল। তখন উনি গরমে ছটফট করতে করতে থানা লণ্ডভণ্ড করতে থাকেন। অবশেষে একটা ড্রামের জলে ঢুকে পড়েন। পড়েই রেগেমেগে চাবিটা অন্যদিকে মানে, প্লাসের দিকে বেশি করে ঘুরিয়ে দেন। ফলে টেম্পারেচার কমে জিরো হয়ে গেল। জল হল বরফ।

কিন্তু, উনি এ'টা ভুল করলেন কেন ? বটুকদা বলে ওঠেন।

না উনি ঠিকই ঘুরিয়েছেন। আসলে অ্যাপারাটাসে সংকেত চিহ্নগুলোই উল্টো লাগানো ছিল।

তার মানে ?

ওটা স্যারই করেছিলেন কিনা। আমার মনে হয় তার জন্যে ও'র একটা চশমাই দায়ী। সেই চশমায় গ্লাসটা প্রায়ই দেখায় মাইনাসের মত। যাই হোক, তারপর মাসীমা ত রেগে আগুন। বিজ্ঞানের বাপান্ত করে ছাড়লেন। বললেন, তোদের বিজ্ঞানের মুখে আগুন। মানুষটাকে শেষ করে দিয়েছিল গা !

তারপর ?

তারপর একটা ইয়ে দিয়ে স্যারকে কয়েক ঘা—

কি দিয়ে ? বটুকদা ছাড়বার পাত্র নন।

মানে, ঐযে, ঝাঁটা দিয়ে। আর তারপর থেকেই স্যারের শরীর খারাপ। কারুর সঙ্গে দেখা করতে চান না।

ব্রোণ্ডি চুপ করতে বটুকদা বললেন, আচ্ছা মিঃ ব্রোণ্ডি, আজ আমরা উঠছি। ইনি একদিন আসবেন পরে।

আমি বললাম, ঐযে, ও'র কাছে সেই লিকুইড গল্পের ব্যাপারটা জানতে আসব।

আপনার একটা চিঠি এসেছে স্যার! কয়েকটা খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে ব্রোণ্টি বলল।

প্রোফেসার বুদ্ধিধর তখন দুটো বেঁটে বেঁটে কাচের জারে তার সংযোগ করে বিদ্যুতের সার্কিট তৈরি করছিলেন।

কে লিখেছে সেটা বল।—ব্রোণ্টির দিকে না তাকিয়েই বললেন প্রোফেসার।

আপনার মামা।

মামা মানে? একটু অবাক হয়ে বললেন প্রোফেসার। কোন্ মামা? মামা ত' আমার অনেক। মায়ের নিজের ভাই ছাড়া খুড়তুত, জ্যাঠতুত ইত্যাদি অনেক তুতো ভাই মিলে মামার সংখ্যা অসংখ্য। কখনও গুণে দেখি নি—

বসিরহাটের বংশীমামা।—বলল ব্রোণ্টি।

তাই বল। বংশীমামা মাঝে মাঝে খবর নেন, খবর দেন। তা, কি লিখছেন পড় ত'।

পড়ছি—কল্যাণীয়েষু, বুদ্ধিধর, তোমাকে ইতঃপূর্বে চিঠি দিয়াছি কিন্তু কোনো উত্তর না পাইয়া চিন্তিত আছি—তুমি নিশ্চয়ই কাগজে পড়িয়াছ যে আমি ঈশ্বরের কৃপায় ইলেকশানে জয়লাভ করিয়াছি। আমি গ্রামের লোকের জন্য একটা পাব্লিক স্কুলও করিয়া দিয়াছি। সম্প্রতি একটা কারণে তোমার সাহায্য দরকার। তুমি কি একবার এখানে

আসিতে পারিবে ? যদি একান্ত না পার, তাহা হইলে আমাকেই যাইতে হইবে। তোমার বিজ্ঞানচর্চায় আমার প্রচুর সহানুভূতি আছে জানিবে।

ইতি—আঃ বংশীমামা

বটে ? প্রোফেসার বলে ওঠেন, বংশীমামা একজন কারিৎকর্মা লোক। বুঝলে রোণ্টি।

হ্যাঁ স্যার, শুনেছি। কিসে যেন তিনি অনেক টাকা পেয়ে বরাত ফেরান ? সেই···মাদুলি, না ?

আরে তোমার তো মনে আছে দেখছি! বললেন প্রোফেসার। স্বপ্নাদ্য মাদুলী দিয়েই তিনি লাল হয়ে গেলেন। যত সব বোগাস!

বোগাস কোন্‌টা স্যার? ব্রোণ্টি যেন হোঁচট খেল। স্বপ্নাদ্য মাদুলি না তাঁর লাল হওয়া?

আরে' ঐ মাদুলিটা একেবারে বোগাস! বিজ্ঞানের লোক হয়ে এটা বুঝতে পারলে না তুমি? তুমি মাদুলি পরলে আর তোমার পেটের কলিক সেরে গেল! তুমি মাদুলি পরলে আর পরীক্ষায় ড্যাং ড্যাং করে ফার্স্ট ডিভিশান মেরে বেরিয়ে গেলে— !

কিন্তু স্যার, মাদুলি দিয়েই উনি বড়লোক হয়ে গেলেন, এটা তো সত্যি?

রাইট ইউ আর! ব্রোণ্টি, তুমি ধরেছ ঠিক। আমাদের দেশে তুকতাক ভাঁওতা দিয়ে অনেকেই কাজ গুছোয়। মামাও তাই করেছে। যাক, এখন কি করা যায় বল? একদিন যাবে?

মন্দ হয় না।—বলল ব্রোণ্টি,—একটু মুখ বদলানো যাবে। তবে আমাদের গাড়িটা যেতে পারবে কি? অতটা লং ডিসট্যানস ত'।

ঠিক, আমাদের গাড়ি নিলে খুবই রিস্ক নিতে হবে। তার চেয়ে মামাকে বরং লিখে দিই, আমরা যেতে প্রস্তুত, তোমার একটা গাড়ি পাঠাও।

চিঠি চলে গেল।

দুই সপ্তাহ পরে।

মামার ল্যান্ডরোভারে প্রোফেসার ও ব্রোণ্টি যাত্রা করেছেন। হাটের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ব্রোণ্টি শুনতে পেল আশপাশের লোকেরা বলাবলি করছে, 'এটা বংশীবাবুর গাড়ি না?'

বাড়ির গেটে শ্বেতপাথরের ট্যাবলেট। তাতে বাংলায় লেখা 'বংশীবদন তালুকদার'।

গেট পেরিয়ে চকমেলানো বাড়ি।

আয় আয়!—মামা ওঁদের সাদর অভ্যর্থনা করেন।

প্রোফেসার দেখলেন, মামাকে চেনা শক্ত। বছরে বেশ বেড়েছেন। মুখমণ্ডল চকচক করছে এবং কপালটি বিস্তৃত হয়ে প্রায় মাথার চাঁদি পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। হ্যাঁ, অর্থ ও প্রতিপত্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সব দিকেই মামার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে।

বল, তোমার কথাটা শুনি এবার। চা, জলযোগ সারা হলে প্রোফেসার বললেন মামাকে।

বলব বলব। মামা বলেন।—বলব বলেই ত' তোকে আনালুম।

তারপর একটু চাপা গলায় বললেন, হ্যাঁরে তোর সঙ্গে ঐ ছেলেটি কে?

ওহো, তোমায় বলিনি বুঝি? ও হ'ল ব্রোণ্টি। আমার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট। —বললেন প্রোফেসার।

মামা বললেন, বাবা ব্রোণ্টি, তুমি একটু বাইরে যাও ত'। আমাদের একটা প্রাইভেট টক্ আছে।

ব্রোণ্টি চলে যেতে মামা বললেন, দেখ, একটা মুস্কিলে পড়েছি, তাই ভাবলুম-—

কি মুস্কিল? তুমি ত' বেশ আছ মামা! এই বাড়িঘর, ধনদৌলত, এই নামডাক—

ঐখানেই ত' মেরেছে আমাকে, ঐ নামডাক।—বলে উঠলেন মামা।

কেন? কি হ'ল? চশমার পুরু লেন্সের মধ্যে দিয়ে তাকালেন প্রোফেসার।

ব্যাপার কি জানিস? আমায় তো আগে দেখেছিস, আবার এখন দেখছিস। অনেক তফাৎ। বুঝলি, অনেক তফাৎ! লোকে আমায় মানে গণে, তাই না ভোটে জিতলুম।

তোমার মাদুলির বিজনেস আছে ত'?

সেটা থাকবে না? কি বলিস! ঐ ত' আমার লক্ষ্মী। ওখানে একজন স্বামীকে রেখেছি ইন-চার্জ করে, স্বামী বায়বানন্দ।

তা তোমার মুস্কিলটা কি বললে না ত'?—প্রোফেসার আবার পেছু টানেন।

বলছি। এ সব কথা ত' সবার সামনে বলা যায় না। ঐ যে বলছিলি নামডাক, যাকে বলে জনপ্রিয়তা! ঐ নামডাকের ঠেলা এখন সামলানো দায়। আজ এখানে সভা, কাল ওখানে মীটিং। আজ স্পোর্টসের প্রাইজ, কাল হয়ত লাইব্রেরীর উদ্বোধন। কত বলব? নিত্য লেগে আছে। আর আমাকে না হলে চলবে না। আমাকে সভাপতি না করে ছাড়বে না ওরা। আর সভাপতি হলেই কিছু বলতে হবে ত'—যাকে বলে ভাষণ। সেই ভাষণ একটা দিতেই হবে—আর সেইখানেই হচ্ছে আমার মুস্কিল। বুঝতে পারলি?

তা ভাষণের জন্যে তৈরি হয়ে নেবে।—বললেন প্রোফেসার।—একজন লিখিয়ে রেখে দাও ভালো মাইনে দিয়ে। সে তোমায় লিখে দেবে—

আহা, তা কি আর রাখি নি? ঐ ত' দিব্যেন রয়েছে, ডবল এম.এ.। সে না হয় লিখে দিল, কিন্তু আমায় ত' বলতে হবে। এক একজন কেমন গড় গড় করে বলে যায়। আর আমি, বলতে উঠলেই, আমার গলা বুজে আসে, জিভ শুকিয়ে যায়। হ্যাঁ রে, কি বলব কিছুই মনে আসে না তখন। মাঝে মাঝে···তোতলা হয়ে যাই···বুঝলি···হাঁটু কাঁপতে থাকে। কি বিপদ বল ত'!

কেন, তুমি লেখাটা মুখস্থ করে নেবে, প্রোফেসারের পুনরুক্তি।

মুখস্থ কি রে! মুখস্থ করার শক্তি আমার নেই। তাই ত' তোর কথা মনে পড়ল। তুই ত' অনেক দিকে মাথা খাটাস···ওরে নে-পা-ল আর একটু করে চা দিয়ে যা আমাদের—

সমস্যাটা, মামা, তোমার গুরুতর।—চিন্তিত সুরে বললেন প্রোফেসার। বিজ্ঞান এখানে কি করতে পারে সেটা ভেবে দেখতে হবে। এখনই ত' তোমায় কিছু বলতে পারছি না।

তুই পারবি পারবি। আমি বলে দিচ্ছি তুই পারবি।—মামা বলতে থাকেন।—আমি চাই কি জানিস, গড় গড় করে ভাষণ বলে যাব, সভার লোক অবাক্ হয়ে যাবে, হাততালি দেবে—তবেই ত' সভাপতি, তবেই ত' এই বংশীবদন তালুকদার।

প্রোফেসার আর রোণ্ডি কলকাতায় এসেছে, তাও বেশ কিছুদিন হয়ে গেল। এর মধ্যে মামার আর একখানা চিঠিও এসে গেছে। কিন্তু প্রোফেসার বুদ্ধিধর অন্য কাজে এত ব্যস্ত যে ওদিকে মন দিতে পারেন নি।

সেদিন দুপুরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

রোণ্ডি এসে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রোফেসার মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, কিছু বলবে?

হ্যাঁ স্যার! রোণ্ডি বলে।—আমাদের ল্যাবরেটরীর পশ্চিম দিকে ছাদ থেকে জল পড়ছে।

তা আমি কি করব?

আপনি যদি বাড়িওলাকে বলেন অ্যাস্‌বেস্টস্‌গুলো রিপেয়ার করে দিতে—

আমাকে বলতে হবে কেন? কী আশ্চর্য! বাড়ীওলারা কি চায়

আমরা কাজকর্ম বন্ধ করে দিই ? আচ্ছা, তাই হবে—যাব তার কাছে। সে ত' আবার বদ্ধ কালা। তাই না ?

হ্যাঁ স্যার, চেঁচিয়ে কথা বলতে হবে।

বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ঘনশ্যামবাবু লাঠিটা নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরুবেন এমন সময় প্রোফেসারের মুখোমুখি।

এই যে প্রোফেসার মশাই, সকালবেলায় কি মনে করে ?—ঘনশ্যামের প্রশ্ন।

আমি আপনার কাছেই এসেছি।—বললেন প্রোফেসার। বেশ চেঁচিয়েই বললেন।

দেখুন, আপনার কারখানা, না কি ওটা ? ওখানে কি যে হয় জানি না।--বললেন ঘনশ্যাম।—মাঝে মাঝে গ্যাসের গন্ধে টেকা যায় না।

প্রোফেসার বললেন, আপনার ছাদ থেকে জল পড়ছে—

কি পড়ছে ? হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে আজ।

ছাদটা ফুটো, সেরে দি-তে হবে—

কি করতে হবে ? চুনকাম করতে পারব না আমি, অনেক খরচ।

ছাদ দিয়ে—জ-ল—প-ড়-ছে—

হ্যাঁ, আমার ছেলে ফাস্ট ইয়ারে পড়ছে !

শুনতে পাচ্ছেন না ?—খুব চেঁচালেন প্রোফেসার।

দাঁড়ান দাঁড়ান, আমার যন্তরটা লাগাই।—বলেই বুড়ো পকেট থেকে তাঁর হিয়ারিং এড্ বার করে কানে লাগিয়ে নিলেন।

হ্যাঁ, এইবার বলুন, এইটা হাতে নিন।—বলে বুড়ো চোঙ্গাটা এগিয়ে দিলেন।

-আমার ল্যাবরেটরীর ছাদটা ফুটো—জল পড়ছে—

ও, ছাদ দিয়ে জল পড়ছে ? তা এই পশ্চিম বাংলায় কোন্ বাড়িতে পড়ছে না তাই বলুন ? ড্যাম্পো যে মশাই—

হঠাৎ প্রোফেসারের মাথায় একটা আইডিয়া ঝিলিক খেলে যায়। তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন—ই-উ-রে-কা ! বংশীমামা ইজ সে-ভ্-ড্ ! বলেই প্রোফেসার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলেন তাঁর বাড়ির দিকে।

ঘনশ্যাম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে। যন্তরটা কান থেকে খুলে নিয়ে বিড় বিড় করেন, পাগল পাগল ! প্রোফেসার না বদ্ধ পাগল !

বসিরহাটের তালুকদার মশাইয়ের বাড়িতে।

ওগো, কোথায় গেলে ? বংশীবদন হন্তদন্ত হয়ে গিন্নীর খোঁজ করেন। শোনো, বুদ্ধিধর এসেছে, নিশ্চয়ই সুখবর আছে। ওকে ভালো করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো, গোটা দুই ইলিশ আনাও দেখি।

শুনুন মামা—প্রোফেসার বললেন, আপনার জন্যে এক অভাবনীয় ডিভাইস করেছি। দেখি, এদিকে এগিয়ে আসুন। এইটা কানে লাগাতে হবে। আর এই তারটা সোজা চলে যাবে আপনার পকেটে। সেখানে থাকবে এই মিনি রেকর্ডার। পকেটে হাত দিয়ে আপনি সুইচ টিপে অন করলেই কানে শুনতে পাবেন আপনার ভাষণ। যা শুনবেন তাই বলে যাবেন চোখ বুজে—

দাঁড়া, দাঁড়া। দেখে নিই ভালো করে। বংশীবদন পুলকিত ও কিঞ্চিৎ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠেন। চেঁচিয়ে বলেন, হ্যাঁ গো—ইলিশ মাছ পাওয়া গে-লো-ও-ও ?

প্রোফেসার বলেন, এই দেখুন আমি ফিট করে দিলুম। সাউণ্ড শুনতে পাচ্ছেন ত' ?

হ্যাঁ, বেশ শুনছি—স্পষ্ট কথা শুনতে পাচ্ছি।

বলে যান।

ভদ্রমহোদয়গণ···আজ আমাকে আপনারা···যে সম্মান দিয়েছেন··· তার জন্যে·· আমি কৃতজ্ঞ···

বাহ ! এ আমি বেশ বলতে পারব।—মামা সহাস্য হয়ে ওঠেন। এ যেন আমাকে কেউ প্রম্‌টো করছে। যেমন থিয়েটারে করে। কিন্তু বাবা বুদ্ধিধর, এক এক সভায় এক এক রকম বক্তৃতা দিতে হবে যে—

প্রোফেসার বললেন, তা ত' হবেই। যেখানে যে বক্তৃতা দিতে হবে সেটা আপনি আগেই রেকর্ড করে নিচ্ছেন ত'। ঐ ক্যাসেটের মধ্যেই তা থাকবে। আপনি শুধু যথাসময়ে কায়দা করে পকেটে হাত ঢুকিয়ে সুইচটা টিপে দেবেন।

তা যেন হল,—মামা এবার আর এক সন্দেহে আশঙ্কিত। কিন্তু এই তারটা যে লোকে দেখতে পাবে, চাঁদ ! বিশেষ করে আমার পাশের লোক যারা ডায়াসে থাকবে। তারা যদি ধরে ফেলে তা হলেই ত' কেলেঙ্কারীর এক শেষ।

আপনি সভা-সমিতিতে কি পোষাক পরে যান ?

আমি ? পাঞ্জাবীর ওপর পরি জহর কোট।

তাতে একটু অসুবিধে হতে পারে।—বললেন প্রোফেসার।—তার চেয়ে আপনি একটা লং কোট করিয়ে নিন। কোটের রংএর সঙ্গে যদি তারের রং মেলে তা হলে ওটা একেবারেই দেখা যাবে না। আর কাঁধের ওপর একটা যদি চাদর রাখতে পারেন তা হলে আপনার কানের কাছে ঐ বস্তুটি কারুর চোখে পড়বে না।

তার জন্যে আর ভাবনা কি, আমি আজই অর্ডার দিচ্ছি। বাবা বুদ্ধিধর, সত্যিই তোর বুদ্ধি আছে। এটা যদি ঠিক মত কাজ দেয় তা হলে তুই দেখে নিস, আমি বক্তৃতায় রেকর্ড করে ছাড়ব। অল ইণ্ডিয়া লীডার হওয়া ত' কিছুই নয় আমার কাছে। চ, বেলা হল, আমরা খেতে যাই, কই গো—

বুদ্ধিধর চলে যাওয়ার পর বংশীমামা নতুন সাধনায় লাগলেন। দিব্যেনকে দিয়ে বক্তৃতা লেখান, রেকর্ড করেন, আবার তারপর সেটা চড়িয়ে, কানে কল দিয়ে প্র্যাকটিস করেন। রকমারি সভার রকমারি বক্তৃতা।

মামী একদিন বলেন, হ্যাঁগা, তোমার কানে ওটা কি ? কানে কি কম শুনছ নাকি ?

না না, ও সব তুমি বুঝবে না।—মামার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

বুঝব না, মানে ? আজকাল আমার কথা কানে তোল না, এটা ত' দেখছি। হায় হায়, শেষে কালা হয়ে যাবে নাকি ?

মামা রেগে যান, নাকি রাগের ভান করে বলেন, কালা হব কোন্ দুঃখে ? এই দেখ এটা খুলে ফেলছি। এবার যা বলবে সব শুনব— হল ?

শুনতে সত্যিই তিনি পাচ্ছিলেন।

একটি মহিলা সমিতির সভা। সেখানে উদারহৃদয়, সমাজসেবী, মানবদরদী বংশীবদন ছাড়া আর কে সভাপতি হবেন ? এই সব বিশেষণ দিয়ে তাঁর পরিচয় দেওয়া হল। লং কোট পরিহিত হয়ে ডায়াসে মধ্যমণি হয়ে জাঁকিয়ে বসেছেন তিনি। মাঝে মাঝে অকারণে বাঁ হাতটা চলে যাচ্ছে পকেটে, আর কাঁধের চাদরটাকে মাঝে মাঝে সুবিন্যস্ত করছেন যাতে

চাদরটা তাঁর বাবরি চুলের কিনারা ছুঁয়ে থাকে এবং কর্ণপ্রদেশ ঢাকা পড়ে।

সারি সারি আসনে যত দূর চোখ যায় সবই দখল করে বসেছেন মহিলারা। মাঝে মধ্যে দু-একজন মাত্র বয়স্ক প্রবীণ ব্যক্তি চোখে পড়ে।

তরুণী সম্পাদিকা সমিতির কার্যবিবরণী পড়ে শোনাল। তারপর প্রস্তাব এল, এইবার সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণ দেবেন।

সভাপতি বংশীবদন কিঞ্চিৎ পাংশু হয়ে গেলেন যেন। আড়ষ্টভাবে উঠে দাঁড়িয়েছেন তিনি। তাঁর বাঁ হাত ঠিকই পকেটে চলে গেছে। কানের কাছে গুঞ্জন শুরু হতেই তিনি বলতে আরম্ভ করেছেন ঃ

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী—আজ আপনারা আমায়—বক্তৃতা দেওয়ার—যে সুযোগ দিয়েছেন—তার জন্যে—আমি কৃতজ্ঞ। আমি একটা কথাই—শুধু বলব—আজ দেশে অসাধুতা বাড়ছে—দিকে দিকে—জালিয়াতি জুয়াচুরি—ছড়িয়ে পড়ছে। কই সাহসী বলিষ্ঠ তরুণদের—দেখা পাচ্ছি না ত'! তাই আমার আন্তরিক আশা—হে আমার তরুণ ভাইয়েরা—তোমাদের খেলাধুলা করতে হবে—ব্যায়াম করতে হবে—শরীর গড়তে হবে—"

এই পর্যন্ত বলেই বংশীবদনের খটকা লাগে। তাকিয়ে দেখেন সামনে মহিলারা সব হাসাহাসি করছে। এ কি হল! কানের কাছে লো-স্পীকার বলেই চলেছে—ব্যায়াম, হাডুডু খেলা, স্পোর্টসের কথা। সর্বনাশ! তা হলে কি ভুল বললুম এতক্ষণ? কিন্তু কি করা যায়? এখন ত থামা যায় না।

বংশীবদন হাঁপাতে থাকেন। সারা গা ঘর্মাক্ত। দেহ কাঁপছে। ঐ ত' সবাই হাসছে। ছি ছি ছি! এখুনি ত' কিছু বলা চাই, কিন্তু কি বলবেন?

তিনি বলবার চেষ্টা করেন, আমি আর কিছু বলতে চাই না—আমার শ-রী-র অ-সু-স্থ—বলে তিনি ঝুপ করে বসে পড়েন।

তুমুল হাসি আর হাততালির আওয়াজে সভাস্থল চৌচির হবার উপক্রম হল।

শোনা যায় সেদিন থেকে বংশীবদন রাগে দুঃখে অপমানে জর্জরিত হয়ে দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে বার হতে পারেন নি।

প্রোফেসার বুদ্ধিধরের ল্যাবরেটরী।

আপনার একটা চিঠি এসেছে স্যার! হাতে চিঠি নিয়ে ব্রোণ্ডি এসে দাঁড়াল স্যারের কাছে।

চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে প্রোফেসার বললেন, নিশ্চয় মামার। মানে, বংশীমামার। নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়ে লিখেছেন। দেখলে ব্রোণ্ডি, বিজ্ঞান আমাদের কত কাজে লাগতে পারে! আমরা শুধু জানি না তাকে কাজে লাগাতে। পড়—শুনি।

ব্রোণ্ডি পড়তে থাকে। মাত্র এক লাইনের চিঠি:

"বুদ্ধিধর, আমি আর জীবনে তোমার মুখদর্শন করব না।"—ইতি

বংশীমামা

বাজারে বেগুন কিনছি। বেগুন কেনার সময় আমি প্রত্যেকটি টিপে টিপে দেখে নিই। হাতে যদি ভারী লাগে আর টিপলে শক্ত মনে হয় তাহলে সে বেগুন বুঝতে হবে পাকা বীচিতে ভরা। ভাজা খাওয়া যাবে না। পোড়া ত নয়ই।

বেগুন কিনতে গিয়ে ভাবছি এগুলোর অন্তর্গত বীচি দেখবার যদি X-রে জাতীয় যন্ত্র পাওয়া যেত—ঠিক এমনি সময় আমার বগলের নীচে কার হস্তক্ষেপ অনুভব করলাম।

আর একটু চাপযুক্ত হলেই আমি কাতুকুতুর হাসি হেসে ফেলতাম—কিন্তু তা হল না, পিছনে তাকিয়েই যাকে দেখলুম সে হল ব্রোঞ্চি; আমাদের প্রোফেসার বি ডি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভাল। কতবার দেখা হয়েছে, কতক্ষণ বসে বসে গল্প হয়েছে, সুতরাং ব্রোঞ্চিকে দেখে বরং পুলকিতই হলাম।

কতবার গেছি প্রোফেসারের বাড়িতে কিন্তু তিনি নেই। হয়ত ল্যাবরেটরীতে নয়ত কোন কনফারেনসে গেছেন—সে সময় ব্রোঞ্চিই একমাত্র ভরসা এবং আনন্দদায়ক সঙ্গী।

খুশি হয়েই বলে উঠি, কি মিঃ ব্রোঞ্চি যে, তা আপনি এখানে কেন? মানে, বাজারে?

হাসিমুখে ব্রোঞ্চিও বললেন, কেন আমাকে কি বাজারে আসতে নেই?
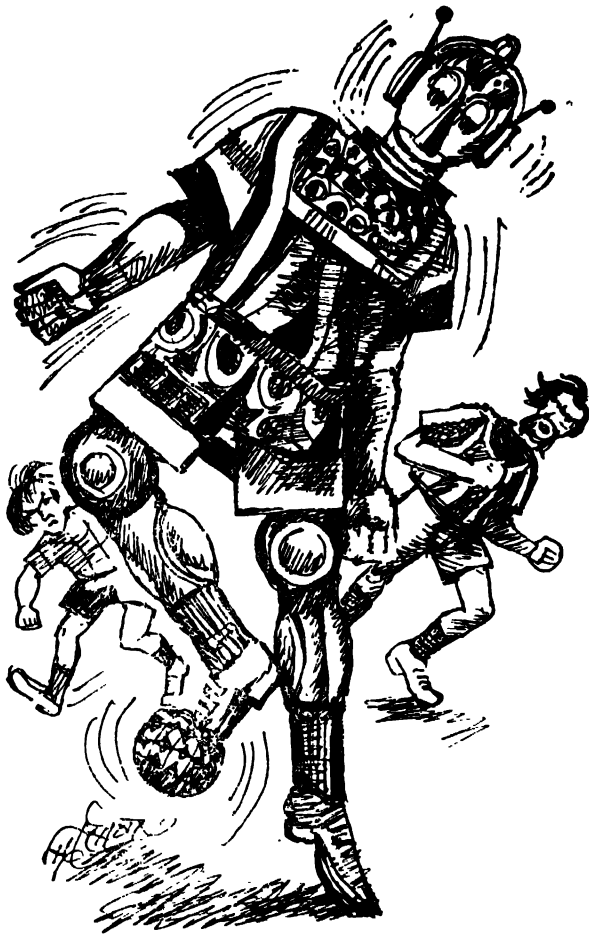
শুনুন, আপনি অনেকদিন ঐ পথ মাড়াননি, অর্থাৎ আমাদের ওখানে যান নি : শীঘ্রই একদিন আসবেন কি ?

বললুম, যাবো, তবে সেটা ঠিক কবে তা বলা শক্ত—

নেক্সট উইকেই আসুন না, তবে একটু সময় হাতে নিয়ে আসবেন। স্যার ত নেই। তাই একটু গল্প-সল্প করা যাবে। তাছাড়া আপনি এ বিষয়ে, মানে, সায়েন্সে ইন্টারেস্টেড কিনা তাই—

স্যার কোথা গেছেন ?

উনি গেছেন সামপাওলো।

ও বাবা, একেবারে পৃথিবীর উল্টোদিকে যে—

কি বাবু, আপনি বেগুন নেবেন নাকি ? বেগুনওয়ালা বিরক্ত হয়ে আমাকে তাড়াতে চায়। বললুম ঠিক আছে আমি পরশুই যাচ্ছি—বলে ব্রোণ্ডিকে বিদায় দিলুম।

দাও হে কর্তা, এবার তোমার বেগুন নেব। বেছে বেছে পাঁচ-ছটা তুলে দিই, হাফ-কিলো দাও।

বেগুন নিচ্ছি আর ভাবছি, লোকটা একেবারে চলে গেল দক্ষিণ আমেরিকা। আমি শ্যামবাজার যেতে হলে দুদিন জল্পনা-কল্পনা করি। কোন রুটে ভিড় কম, কোন যানবাহন আমার পক্ষে খাপ খাবে—কোথায় চেঞ্জ করলে কতক্ষণ দাঁড়াতে হবে ইত্যাদি কত চিন্তা। তারপর হয়ত নার্ভাস হয়ে বেরোনাই হল না। আর এ লোকটা একেবারে চলে গেল সামপাওলো! বাহাদুরি আছে বই কি। কৌতূহলটা বেশ উদ্দীপিত হলে কাজ করার উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়।

যেদিন কথা দিয়েছিলাম সেইদিন বেশ সকাল সকাল ব্রোণ্ডির ওখানে গিয়ে হাজির হলাম।

আমার প্রথম প্রশ্ন হল স্যার কি ফুটবল খেলেন নাকি ? ওসব দেশে ত ফুটবলের চর্চা সব চেয়ে বেশি—

ব্রোণ্ডি খুব অভ্যর্থনা করে বসতে বলল।

এখনই সব শুনতে হবে আপনাকে ? বলল ব্রোণ্ডি, বসুন এক কাপ কফি অন্তত খান, তারপর—

তারপর বলবেন ত ? আমি বলে উঠি।

না সবটা নয়, এটা আপনাদের ক্রমশঃ-প্রকাশ্য সিরিজের মত শুনলে ভাল লাগবে, আপনি ত আর্টিস্ট মানুষ, মানে, কথার আর্টিস্ট। --

কি ব্যাপার বলুন ত ? স্যারের কি নির্দেশ আছে গোপনীয়তা বিষয়ে না কি বলুন। হঠাৎ ওখানে কেন গেলেন ?

উনি নিঃসন্দেহে খেলার ব্যাপারেই গেছেন এইটুকু জেনে রাখুন। ব্রোণ্ডি কথাটা চেপে গেল। সেদিন বিদায় নিয়ে চলে এলুম।

দু-একদিন পরে একটা ছুটি পেয়ে আবার হানা দিয়েছি প্রোফেসারের বাড়িতে। ভাবছিলাম এতদিনে প্রোফেসার এসে যেতেও পারেন।

চাকরটা দরজা খুলে দিল। ব্রোণ্ডি একটা বাটিকের ছাপা লুঙ্গি পরেই আমাকে খাতির করে ভেতরে নিয়ে বসাল। এর আগে তাকে ঐ পোষাকে কখনও দেখিনি।

সংকোচ-নম্র গলায় জিজ্ঞেস করলাম, স্যার এসেছেন নাকি?

না, এখনও ফেরেন নি। তবে আশা করছি দু'-এক দিনের মধ্যেই ফিরবেন। গেছেন ত অনেক দূরে, পৃথিবীর একেবারে উল্টো পিঠে সেই দক্ষিণ আমেরিকায়, মানে, যেখানে ফুটবলের রাজা পেলের দেশ— ৩২/৩৩ ঘণ্টা শুধু প্লেন জার্নি।

সেখানে হঠাৎ কেন? বলে ফেলি আমি। ব্যাপারটা যেন গোল-মেলে লাগছে—

হ্যাঁ, ঐ গোল নিয়েই ব্যাপার। বলছি বলছি।—ওরে দশরথ শুনে যা!

আপনার আগের সেই বিহারীটি কোথা গেল?

সে বিদায় নিয়েছে। তারপর সদ্য রামায়ণের পাতা ছিঁড়ে উৎকল থেকে একে আবিষ্কার।

এর মধ্যেই দশরথ এসে গেল। দশরথকে দেখতে খারাপ নয়, বেশ রাজকীয়ত্ব আছে চেহারায়। মানে, মাথায় একটা মুকুট আর লাল সাটিনের জোব্বা পরালে দিব্যি সে অযোধ্যার রাজা দশরথের ভূমিকায় নামতে পারে।

ব্রোণ্ডি বলল, আমাদের দু'-কাপ চা দে, আর কিছু খাবার, বুঝলি?

বুঝুছি বাবু, কি খাবারো খাইবে? মাদ্রাজী খাবারো পকাই দিব?

মাদ্রাজী কি করবি?

এই ধর, ধোসা হইতে পারে, ইটালি হইতে পারে, সম্বরম্ হইতে পারে—

যা পারিস তাই কর, তবে তাড়াতাড়ি।—বলেই ব্রোণ্ডি আমার দিকে মন দিল:

আমি বললাম, আপনার এখানে ত মেসিনে খাবার তৈরি হওয়া উচিত। কি বলেন?

ও বাবা! দশরথ বলে কি জানেন? বলে মিসনে খাবার-অ খাইলে

পেট-ও জ্বলি যায়। যাক, আমার যেমন দুর্ভোগ, আমি পড়ে রইলুম এইখানে আর উনি বেশ ব্রেজিলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর কত কি দেখছেন, কত ভালোমন্দ খাওয়াদাওয়া চলছে। ওটা তো খাওয়া আর স্ফূর্তির দেশ বলেই শুনেছি—

আরে মশাই, আমি বলে উঠি,—আপনিও ত কত জায়গায় ঘুরেছেন ও'র সঙ্গে। যাক, ওখানকার ঘটনাটা একটু শুনতে পেলে মনটা স্বস্তি পেত।

শুনে স্বস্তি পাবেন কিনা জানি না, তবে ঘটনাটা যে মজার তাতে সন্দেহ নেই। ফুটবলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যাপার ত?—

এ হেন সূচনা-মুহূর্তে মূর্তিমান সেমি-কোলনের মত দশরথের দ্রুত আবির্ভাব হল। দুটো প্লেটে চৌকো কি দুটো পদার্থ রেখে আবার ছুটল সে চা আনতে।

এটা কি রে?

ওটা ইটালি বাবু। ধোসা করিবার-অ চাল-অ ডালি বাটিতে হব। বিড়ম্ব হব—

আমি বললাম, তারপর? ফুটবলের সঙ্গে স্যারের কি যোগাযোগ বুঝতে পারছি না তো!

ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। আহ, এ যে ইটালি! দশরথ বানিয়েছে—স্রেফ অখাদ্য, খাবেন না। ইট্‌লিকে ব্যাটা বলে ইটালি। স্যার আবার বলেন ইটাইলস—সত্যি পোড়া টালির মত শক্ত।

এমন সময় দশরথ এসে গেছে। বোঝা গেল কথাটা সে শুনেছে। সে বলে উঠল, আচ্ছা বাবু, মু কথা দিউছি, ভাল-অ করি পকোড়া পকাই দিব? ওটা টিকে পুড়ি যাউছি। তাই শক্ত হউছি।

যা, তুই যা পারিস কর গে যা!—ব্রোঞ্জির কথায় ঈষৎ বিরক্তি।

আমি কোন গতিকে চা-টুকু গলা থেকে নামিয়ে প্রোফেসারের নবতম কীর্তির কথা শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে আছি।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম,—ব্রোঞ্জি শুরু করে।—স্যার বলেন কি, এখন কি আর অনিশ্চয়তা চলে? মানে, আন্‌সার্টেনটির দিন আছে হে, ব্রোঞ্জি? এই যে খেলা, সে ফুটবলই হোক আর ক্রিকেটই হোক, কেউ হারছে, কেউ জিতছে। কেন তা হবে? এখানে বিজ্ঞান কি বলে? এই হবে কি হবে না, কিংবা হতে পারে, নাও হতে পারে—এ সবের

কথা নেই বিজ্ঞানে। তুমি একটা ইলেক্‌ট্রিক স্যুইচ টিপে বলবে কি আলোটা হয়তো জ্বলতে পারে? না, কখ্‌খনো না। যদি লাইন ঠিক থাকে, বাল্‌ব ঠিক থাকে, তাহলে আলো জ্বলবেই। এই হল বিজ্ঞান।

কিন্তু খেলাতে হার জিত থাকবে না, এ কেমন হবে? তাহলে মজাটা থাকবে কি? আমি ফুট কাটতে বাধ্য হলাম।

ব্রোণ্ডি বলল, উনি বলেন, কেন, ঐ যে তোমাদের ক্রিকেট খেলায় প্রায়ই তো ড্র হচ্ছে আর তাই দেখতে তোমরা হাজারে হাজারে ছুটছ না কি? কি রকম খেলা হচ্ছে সেইটেই আসল কথা। হার জিত যদি নাই হয় তো ক্ষতি কি? এই তো তোমাদের মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গলের খেলা হয়, তাতে এ পক্ষের জয় হলে ও পক্ষ মারমুখো হয়, আর ও পক্ষের জয় হলে এ পক্ষ মারমুখো হয়। দাঙ্গাও বেধে যায়—বল? দুজনেরই মাথা ফাটাফাটি।

ব্রোণ্ডি বলল, আমি বললাম, হ্যাঁ স্যার, সেটা সত্যি। তবে কি জানেন, ঐ গোল হবার মুহূর্তটায় একটা দারুণ উত্তেজনা, মানে, যাকে বলে শি-শিহরণ—শিরায় শিরায় বয়ে যায়।

স্যার বললেন, বুঝেছি বুঝেছি, ওটা ফোর ফর্টি ভোল্টের কাছা-কাছি আর কি! তা সেই গোল দেওয়ার ব্যাপারটা তো আমার পরিকল্পনায় উঠে যাচ্ছে না। আমি যে অটোবলার বানিয়েছি সেটা হচ্ছে কলের খেলোয়াড় কিংবা খেলোয়াড়ের কল, যাই বল। আসলে একটা রোবট। দূর থেকে একে অপারেট করতে হবে কম্প্যুটার দিয়ে। কতটা জোর দিতে হবে, কত অ্যাঙ্গেলে শট্‌ মারবে সব হিসেবের ভেতর। তাই তার শট্‌ হবে শিওর শট্‌। মানে, অভ্রান্ত। গোলে বল যাবেই।

আমি বলে উঠলাম, বাহ্‌, ইন্টারেস্টিং তো! তারপর কি হল? উনি বানালেন নাকি?

হ্যাঁ, সে তো ছ'মাস আগের কথা। সেইটা বানিয়ে উনি আমেরিকান সায়ান্স কাগজে একটা ছোট্ট রিপোর্ট দিয়েছিলেন, আর তার ফলেই তো দক্ষিণ আমেরিকা থেকে চিঠি আর ফোন। শেষে খেলা-পাগল ব্রেজিল থেকে একটা টিম এসে কিনে নিয়ে গেল সেটা।

ভালো দামেই নিশ্চয়? বলে উঠি আমি।

হ্যাঁ, সে তো বটেই। তবে কত দাম তা বলতে নিষেধ আছে। তবে যারা কিনল তারা তো ধনকুবের মশাই, টাকার কুমীর আর কি।

আচ্ছা, তারপর কি হল? মানে, খেলা হয়েছিল নাকি?

নিশ্চয়ই। সেটা বলতে পারি। তবে ওখান থেকে স্যার যে চিঠিটা লিখেছিলেন সেটা পড়লে আরো মজা পাবেন।

তাই পড়ুন।—বলি আমি উৎসাহিত হয়ে।

ব্রোণ্টি চিঠি পড়তে লাগল…

দেখ ব্রোণ্টি, এদেশে এসে এক কথায় বলতে গেলে তোফা আরামে আছি। খেয়ে খেয়ে ওয়েট বেড়ে গেছে। এরা সবাই পেটুক, কী খাওয়া যে খায় এরা! খুব খেতে ভালবাসে, আর জিনিসও অফুরন্ত। তবে দামও তেমনি, আর সে দাম দেবার ক্ষমতাও আছে এদের। যাক, আমার অসুবিধে হচ্ছে পর্তুগীজ ভাষা ভালো জানা নেই তো! তার ওপর এখানকার এক প্রোফেসার মিঃ পেড্রো, লোকটার মাথা খুব পরিষ্কার, সায়ান্স নিয়ে রাতদিন পড়ে আছে। ওরা পেট্রোল বাদ দিয়ে alcohol দিয়ে গাড়ি চালায়। পেড্রো সেই রকম একটা factory-তে কাজ করে। কিন্তু হলে কি হবে, বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা জিনিস আছে, সব দেশেই আছে সেটা। সেটা হচ্ছে, ইংরেজিতে যাকে বলে 'জেলাসী'। আমি বিদেশী, একজন ইণ্ডিয়ান, একটা কৃতিত্ব নেব এটা সে যেন সহ্য করতে পারে না। শেষকালে সেই গড়বড় করল। সে কথা পরে বলছি।

আমার অটোবলারকে ওরা সংক্ষেপ করে নাম দিল অব্লার। একটা খেলায় তাকে নামান হয়েছে। দেখা গেল ঐ শিশুর শটের জন্যে ৫টার মধ্যে ৪টি গোল ও-ই দিল।

সেই থেকে ঐ পেড্রো আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আমিও একটু সাবধানে চলছি।

এমনি সময় সাবধানতার সঙ্গে দশরথও দু'টি প্লেট নামিয়েছে আমাদের সামনে। তারপর হাসিমুখে বচনও ছেড়েছে। সে বলল, হিন্দীওলারা খায় পকোড়া, এরে মুই লোক-অ কই কচোড়া। মানকচুর সঙ্গে ডালি বাটি তেলে ভাজুছি। খাইকিরি দেখ।—দশরথ বাংলায় বলবার চেষ্টা করে।

আমরা দু'জনে দু'-চারটে করে ঐ 'কচোড়া' প্লেট থেকে তুলে মুখে দিচ্ছি আর চিবুচ্ছি।

তারপর স্যারের কি হল? ব্রোঞ্চিকে আবার ঠেলে পাঠাই ব্রেজিলে।

পড়ছি—তারপর একটা বড় খেলা। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে যে বড় মাঠ সেই বিখ্যাত মারাকানা স্ট্যাডিয়ামে। সামপাওলো ভারসেস্ ব্রেজিলিয়া। সামপাওলো নামিয়েছে আমাদের অবলারকে। অন্য দলের প্লেয়াররা প্রথমে একে মানুষ ভেবেছিল। তারপর ওর ধরনধারন দেখে তাজ্জব। ভাবল ওদের প্লেয়ার শর্ট, তাই একে নামিয়েছে। তারপর খেলা শুরু হ'ল। অবলার খেলছে স্ট্রাইকারের পোজিশানে। কিন্তু তার পায়ে বল আর আসে না। সকলে সাবধান হয়ে গেছে ত। প্রাণপণে চেষ্টা করছে ওর পায়ে যেন কোনো মতেই বল না যায়। পাক্কা বারো মিনিট কেটে গেল। তারপরে এল একটা বল। ওর পোজিশান থেকে এমন অ্যাঙ্গেলে শট একখানা করল না—একেবারে ছবির মত। বল একেবারে গোলের নেটের মধ্যে।

এইবার ব্রেজিলিয়া তেড়ে খেলতে লাগল। ওরা ওর পায়ে কিছুতেই বল ঘেঁষতে দেয় না। সেই ওয়ান টু নীল হয়ে আছে। দেড় ঘণ্টা জবর লড়াই চলছে।

তারপর হঠাৎ এক খানা বল এল গড়িয়ে গড়িয়ে সামপাওলোর লাইনস থেকে একেবারে অবলারের ডান পায়ের কাছে। ব্যস—

ভাবছি এবার নির্ঘাৎ কিছু একটা হবে। কিন্তু বিভ্রাট দেখ! রিমোট কনট্রোল দিয়ে অপারেট করতে করতে হঠাৎ গলা খুসখুস করে এমন কাশি এল যে পেড্রোকে দিতে হল অপারেট করার ভার।

হঠাৎ দেখি অবলার প্রচণ্ড এক শট হাঁকড়েছে। কিন্তু মেরেছে টো দিয়ে। তার ফলে বলটা গেছে তার পায়ে ঢুকে।

সারা মাঠ কেঁপে উঠল হাসিতে। আমি কিন্তু চমকে উঠেছি। জোরটা বেশি হয়ে গেছে নির্ঘাৎ। কিন্তু তখন করব কি? করবার কিছু নেই যে।

অবলার কিন্তু সেই বল নিয়েই টলতে টলতে চলল বিপক্ষের গোলের দিকে। ওহ, ব্রোঞ্চি, সে কি চলা! কেউ তাকে রুখতে পাচ্ছে না। সে সোজা গিয়ে গোলীকে ঠেলে দিয়ে ঢুকে গেল বল শুদ্ধু গোলের মধ্যে। বল তখনও ওর টো কামড়ে।

হৈ হৈ চীৎকারে মাঠ ভেঙ্গে পড়ে আর কি!

খেলা শেষ হল রেফারীর হুইসিলে। সামপাওলো জিতে গেল টু নীলে।

এমন সময় হঠাৎ 'উহ্' বলে ব্রোঞ্চি দু'হাতে মুখ চেপে ধরল।

কি হল?

আরে মশাই, কী সাংঘাতিক মুখ কুটকুট করছে—

আমি এতক্ষণ কিছু বলিনি, কিন্তু মুখ থেকে গলা অবধি কী অসহ্য রকম চিড়বিড় যে করছিল, তা বলা যায় না। উঠব ভাবছি, এমনি সময় আবার চাকরটা একটা ফরেন লেটার হাতে নিয়ে ঢুকল।

ব্রোঞ্চি চিঠি খুলেই বলে, এই তো স্যারের চিঠি।

কি লিখছেন দেখুন তো? নিশ্চয়ই চলে আসার খবর।

কোথায় মশাই! আর এক বিপত্তি ঘটেছে। তবে শুনুন, সেই খেলারই ব্যাপার। বিপক্ষ দল, মানে ব্রেজিলিয়া, মামলা ঠুকেছে। তারা বলছে, অন্যায়ভাবে তাদের হারানো হয়েছে। এ গোল তারা স্বীকার করে না: প্রথম কারণ, রোবট, মানে ঐ অবলার দিয়ে খেলা বেআইনী। দ্বিতীয় কারণ, ফুটো বল দিয়ে গোল অসিদ্ধ। নিন ঠ্যালা এখন।

স্যার লিখেছেন, ফ্যাসাদ দেখ! প্রথম পয়েন্টটা উকিলদের মতে নাকচ করা যেত কিন্তু দ্বিতীয় পয়েন্টটা গুরুতর। আর ওটা ঐ পেড্রোরই দুষ্টুমি বলতে হবে। এখন মামলার সাক্ষী হিসেবে আমাকে থেকে যেতে হবে, কতদিন যে থাকতে হবে কে জানে? দেশের জন্যে উতলা হয়ে উঠছি। কবে যে আবার নানা-জঞ্জালে ভরা খানা-খন্দময় আমাদের কলকাতার মাটিতে গিয়ে দাঁড়াব আর মশার ভনভনানি শুনব, তার জন্যে সব সময় মনটা আঁকুপাঁকু করছে। ইতি—

কথাময়বাবু, একটা কথা বলব?—ব্রোঞ্চি বলে উঠল।

কি, বলুন না।

আমায় গল্প লেখা শেখাবেন?

গল্প লেখা? আপনি লিখবেন?

কেন, শক্ত বুঝি?

আরে না না। এক সময় আসবেন বাড়িতে, আলোচনা করা যাবে। আজ উঠি, কেননা আপনার ল্যাবে তো তেঁতুল নেই, সেটা আছে আমার বাড়িতে—

বাড়িতে পা চালিয়ে চলে এলুম। এসেই তিনটে তেঁতুল মুখে দিয়ে চিবিয়ে ঘণ্টা দুই বসে রইলুম।

মেয়ে ডালিয়া এসে একবার আমায় দেখে গেল। গিয়ে তার মাকে বলছে শুনতে পাচ্ছি, মাম্মী, আমি আজ ফ্রক পরে স্কুলে গিছলুম বলে• বাপি রাগ করেছে। কি রকম মুখ গুঁজে গম্ভীর হয়ে বসে আছে দেখবে এস—

কথাময়বাবুর সঙ্গে প্রোফেসার বি, ডি,-র, মানে প্রোফেসার বুদ্ধিধরের সেদিন দেখা হয়ে গেল। দেখা হল অপ্রত্যাশিতভাবেই বলতে হবে। সেটা আবার কোথায়? যেখানে মানুষ পথ চলে অতি সাবধানে। একটা চোখ রাখে খানাখন্দ করোগেট সীটের বেড়ার দিকে আর একটা চোখ রাখে ভূগর্ভের খাদের দিকে। সেই রকম সি এম ডি এ-র ক্রিয়া-কাণ্ডের এক কুরুক্ষেত্রে। অর্থাৎ পাতাল রেলের কাজ হচ্ছে যে পাড়ায় সেই ময়দানেরই এক জায়গায়।

আরে, প্রোফেসার সাহেব, অনেকদিন পরে দেখা, বলে হাত দুটো কপালে ঠেকাবার ভঙ্গি করেছেন কথাময়বাবু।

প্রোফেসার বি ডি চিরকালই অন্যমনস্ক মানুষ। ওঁকে দেখেও দেখতে পাননি বলেই মনে হল। কিংবা দেখার যোগ্য নয় বলেই দেখেন নি, তাও হতে পারে!

যাই হোক, কথাময়বাবুকে স্বরগ্রাম চড়াতে হল এবং শুধু তাই নয় নমস্কারের বদলে প্রোফেসারের ডান হাতটা ধরে কষে করমর্দন করতে হল।

ওহো কথাময়বাবু, তাই না? দি গ্রেট সাহিত্যিক—

আজ্ঞে হ্যাঁ। নামটা মনে আছে তাহলে!

আরে, তা থাকবে না কেন। মনে সবই থাকে, তবে ব্রেনের রকমারি

কম্পার্টমেণ্টে কানেকশান হলেই মনে পড়ে যেমন কানেকশান হলেই আলো জ্বলে আর কি।

চলুন না একটু কোথাও বসা যাক, বলেই কথাময়বাবু অন্য প্রসঙ্গের এবং আর একটু অন্তরঙ্গতার সূত্রপাত করলেন।

আমি একটু যাচ্ছিলাম আই সি আই-এর বাড়ি, তা কিছুটা সময় আছে হাতে।

ময়দানে দিন দিনই বসবার জায়গা কমে যাচ্ছে। এক জায়গায় একটু

পুরু ঘাসের গালচে দেখে বসেছেন প্রোফেসার। বসেই বললেন, পঁয়তাল্লিশ বছর পরে এইখানটা কি হবে বলুন ত ?

বসবার জায়গা যা আছে তাও থাকবে না।

একটা সিগার বার করে প্রোফেসার বললেন, বাজার, বাজার! গড়িয়াহাট মার্কেটের মত বাজার! দোকানে আর মানুষে গিজ গিজ করবে। নীচে ত পাতাল রেল থাকবেই আর ওপরে হয়ত দু-চারটে ফ্লাইওভার হবে, যা দিয়ে গাড়ি চলবে। কিন্তু এখানে দাঁড়ালে কান পাততে পারবেন না—প্রোফেসার একবার বাঁ হাতের ঘড়িটা দেখলেন।

কথাময়বাবুর আসল কৌতূহল অন্য জায়গায়। তাই তিনি আজে বাজে কথার জঞ্জাল সরিয়ে বলে ফেললেন, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিগ্যেস করব ?

কি বলুন, আর মিনিট পাঁচেক আছি এখানে।

কথাময়বাবু একটু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, আমার মনে, অনেকেরই কৌতূহল, আপনি এখন কি নিয়ে কাজ করছেন ?

সিগারটা ধরিয়ে প্রোফেসার বি ডি একটু হেসে বললেন, এই কথা ? আমার এবারের প্রোজেক্ট সম্বন্ধে বলতে গেলে ত সময় লাগবে। তবে সংক্ষেপে বলতে হলে 'দোদুল স্বর্গ' ত। ডিটেলস বলার সময় নেই, একদিন আসুন না আমার ল্যাবরেটরীতে।

স্বর্গ ? কথাময়বাবু ঢোক গেলেন।

প্রোফেসার বললেন, 1971-এ আমি যখন জাপান যাই, তখনই আমার মাথায় এটা গজায়। এতদিন কাজ করতে পারিনি।

কেন ? অসুবিধেটা কি ছিল ?

অসুবিধে! অসুবিধেটা টাকার। মানে বেশ খরচের ব্যাপার আছে ত। দেখুন মানুষকে সুখী করার জন্যে বিজ্ঞান মুখিয়ে আছে কিন্তু মানুষ কি কচ্ছে ?

কেন ? আমরা ত প্রকৃতিকে পদে পদেই জয় করছি মশাই এখন! তাই না কি ?

একটু ক্ষুব্ধস্বরে প্রোফেসার বললেন, দেখুন ঐ জয় কথাটাতেই আমার আপত্তি। জয় করি কখন ? একজন রাইভ্যালের সঙ্গে লড়াই হলে একজন জেতে। সে যুদ্ধই হোক আর খেলাই হোক। আর এটা হচ্ছে অন্যরকম। প্রকৃতি এক Store House, ও দেশের প্রকাণ্ড

Super Market-ও বলতে পারেন। সেখানে আমরা কচ্ছি কি, একটা ছোট্ট সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে নেংটি ইঁদুরের মত লক্ষ লক্ষ জিনিসের থেকে দু'-একটা টুকরো বার করে আনছি। অবশ্য তার জন্যে কষ্ট করতে হচ্ছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলা যাকে বলে—আচ্ছা, আর তিরিশ সেকেণ্ড আছে। আমি উঠলুম। একদিন আসুন না আমার ওখানে, কেমন ?

হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন প্রোফেসার।

কথাময়বাবু স্বর্গ সুপার মার্কেট নেংটি ইঁদুর ইত্যাদি কথাগুলো মনে মনে তোলপাড় করতে করতে একটা মিনি বাসস্ট্যাণ্ডে এসে দাঁড়ালেন।

এক গাদা চিঠি নিয়ে ঘরে ঢুকল ব্রোণ্ডি।

প্রোফেসার বললেন, ওগুলো আমাদের বিজ্ঞাপনের উত্তর নাকি ?

মনে হচ্ছে, তাই, বলল ব্রোণ্ডি।

মনে হচ্ছে ? হোয়াট ডু ইউ মীন ? দেখ ব্রোণ্ডি, তোমায় অনেকবার বলেছি, আমার কাছে যা আনবে খুলে দেখে আনবে। যা আসবে সাপ ব্যাং সব ধরে দিলে আমার দুটো ঘণ্টা ওয়েস্টেজ—সেটা বোঝ না কেন ? আচ্ছা, বেছে দেখ কোনো Architect-এর চিঠি আছে কিনা।

পাঁচ মিনিট পরে ব্রোণ্ডি আবার এল একখানা চিঠি নিয়ে। এই যে আর একজন জাপানী Architect-এর কাছ থেকে এসেছে, বলল সে।

কি নাম ?

ওকামুচু।

কি করে সে ? past experience লিখেছে ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ও বড় বড় বাড়ি বানিয়েছে সাতটা।

খুব ভাল। জাপানীর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা আছে, অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মত বলতে পার। যদি পারি ওকে কাজে লাগাতে। একবার interview করতে হবে। এবার একজন টাকাওলা লোক মানে financier-এর জন্যে বিজ্ঞাপন দিয়ে দাও কাগজে।

লেখাটা যদি আপনি করে দেন—

হ্যাঁ লেখাটা তোমার দ্বারা হবে বলে মনে হয় না। তবে তোমাকেই করতে হবে। জিনিসটা তোমায় বুঝিয়েছি কি মনে নেই আমার।

না স্যার, একটু বলেছিলেন বটে তবে খুব clear হয় নি।

ঐ ত মুশকিল, ভাষার কারিগর ত আমি নই—ঐ ত বলতে বলতেই

আসল লোক এসে গেছেন। কথাময়বাবু। আচ্ছা কথাময়বাবু, আপনি ত কথার লোক, বলুন ত, মানুষ কি চায়?

কথাময়বাবু ঘরে ঢুকেই এক অতি সহজ অথচ অতলস্পর্শ প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে যেন স্রেফ ক্যাবলা বনে গেলেন। এটা প্রোফেসারের বুঝতে দেরী হল না, তিনি বললেন, বসুন বসুন! ওরে, রামভরোসা, দু'কাপ কড়া করে কফি বানাতো, বাবা! আর ব্রোণ্টি তুমি ওকামুচুকে চিঠিখানা লিখে ফেল। যদি তার ফোন থাকে ত ফোন করেও দিতে পার।

ব্রোণ্টি চলে গেল।

রামভরোসা কয়েক মিনিটের মধ্যে দু'কাপ ধূমায়মান কফি এনে রাখল টেবিলে।

চিনি বেশি দিয়েছিস ত? প্রোফেসার-এর প্রশ্ন, চিনি না হলে মস্তিষ্ক চাঙ্গা মানে, stimulated হয় না। হ্যাঁ, আপনাকে কি যেন বললাম?

কথাময়বাবু তোতলার মত বললেন, মা-মানুষ কি চায়? আমার ত মনে হয় স্যার, মানুষ অনেক কিছু চায়। তবে এক কথায় বলতে হয়, মানুষ সুখ চায়।

রাইট! তবে ঐ বাংলা কথাটায় আমি খুব খুশী নই। কেন জানেন? কেউ যদি বলে 'আমি সুখী', আর কেউ যদি বলে 'আয়াম হ্যাপপী'। দুটো কথার ওজনের তফাৎ আছে না? কিছু মনে করবেন না, আমি বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কিছু বলছি না! তবে কতকগুলো কথা বড় হাল্কা, বড় সংক্ষিপ্ত, তাতে অর্থের গভীরতা, আর কি বলে, ব্যাপকতা প্রকাশ পায় না—

কফিতে চুমুক দিয়ে আর একটা সিগার ধরিয়ে প্রোফেসার বললেন, এখন এই সুখ বা হ্যাপিনেস বা আনন্দ যাই বলুন, এর জন্যে মানুষ কি চায়? চলতি কথায় বলে না, বাড়ি গাড়ি চাই?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কিন্তু বাড়িটা কেমন হবে? যার একতলা আছে সে চাচ্ছে তিনতলা। যার তিনতলা আছে সে চাচ্ছে সাততলা—কেবলই যেন ওপর দিকে উঠতে চায়, ঠিক না?

ঠিকই বলেছেন, সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন কথাময়বাবু।

আচ্ছা, আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব। বলুনত, কোন অবস্থায় থাকলে আপনার মনে হয় চিন্তাধারা বেশ তর তর করে এগিয়ে যাচ্ছে, নতুন আইডিয়া আসছে মাথায়, তার সঙ্গে এসে যাচ্ছে নতুন প্লট—

আমার ত দেখুন, এক জায়গায় বসে বসে ভাল না লাগলে বেরিয়ে পড়ি। ট্রাম বাস কিংবা ট্যাক্সি যাতে হোক চড়ে পাড়ি দেওয়া—

তার মানে গতিশীল অবস্থায় থাকতে চান। স্পীডে গাড়ি ছুটলে চিন্তাও ছুটতে থাকে। মানুষ যে গতি চায় তার আর ব্যাখ্যা দরকার হয় না। আর এর জন্যেই না নাগরদোলা আর হরেক রকমের মেরি-গো-রাউণ্ডের আবিষ্কার। লোক পয়সা দিয়ে তাতে চড়ে আনন্দ পায়।

কিন্তু স্যার আপনার ঐ বাড়ির আইডিয়ার সঙ্গে এটা খাপ খাচ্ছে কোথায় ঠিক ধরতে পাচ্ছি না।

পরে পারবেন। আচ্ছা কথাময়বাবু আপনাকে এখন এই প্রশ্নের মধ্যে রাখব যতক্ষণ না—

আবার রোণ্ডির আবির্ভাব। সে বলল, ফোনে কথা হয়েছে। মিঃ ওকামুচু এখুনি আসছেন।

আমি তাহলে উঠি, বলে কথাময়বাবু উঠলেন। কেননা তিনি বুঝতে পারছেন তাঁর উপস্থিতি ওদের কাছে বাঞ্ছনীয় নয়।

পুরো সাহেবী পোশাকে বেঁটে-খাটো একজন জাপানী ভদ্রলোক ঢুকল প্রোফেসারের ঘরে। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—ফোন করেছিলেন মিস্তার রোণ্ডি। আমি ওকামুচু।

আরে, আরে আপনি বাংলা শিখেছেন দেখছি।

হ্যাঁ। অনেকদিন ত কাটিয়ে দিলাম এখানে—

দেখুন, আপনাদের নামগুলো আমার বড় ভাল লাগে। ওকামুচু, হাঁচি মাচি, ফুজিজামা, নিচিনিচি—যাক এখন কাজের কথায় আসা যাক। আপনি কি Architect ?

হ্যাঁ, আমি ত আর্কিটেক্ত আছি। বিল্দিং তৈরি করি। প্ল্যান থেকে প্রাক্তিক্যাল সবই করি—

আমি এই রকম লোকই খুঁজছিলাম। শুনুন, আমার একটা প্ল্যান আছে।

তার ফেরোপ্রিন্ত যদি থাকে দেখতে পারি ?

না না সেটা ত আপনিই করবেন। একটা মালটিস্টোরিড বাড়ি হবে। তবে তাতে ইট কাঠ স্টীল থাকবে না।

ইত কাৎ স্তিল বাদ দিয়ে বাড়ি করবেন কি করে ? তবে অ্যালুমিনিয়ম চালাতে পারেন আর স্তোন ত আছেই—

তাও না। বাড়িটা হবে প্লাস্টিকের।

প্লাস্তিক ? সবতা প্লাস্তিক ?

হ্যাঁ, শোন, আমার আইডিয়াটা। কেমন করে করবে সেটা তোমার ভাবনা। ধর, বিশ তালা বাড়ি উঠল খাড়া হয়ে, কেমন ?

বিশ তালা মালতিস্তোরি আমি বানিয়েছি।

প্রোফেসার বি ডি বললেন। বাড়িটা কিন্তু শক্ত হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে না—

তার মানে ? হোয়াত দু ইউ মীন ?

সেটা দুলবে। যেমন হাওয়ায় দোলে ধানের শীষ, দোলে চেরী গাছের ডাল, দোলে পাইন—সেই রকম দুলবে। দুলবে অথচ পড়বে না। বুঝেছ ?

ওকামুচুর ক্ষুদে চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

সে বলল, তাজ্জব ! নাইস আইদিয়া। কিন্তু সেতা হবে কেমন করে ?

প্রোফেসার বললেন, হবে নাই বা কেন ? প্লাস্টিক এমন আছে যা বেঁকে যায় কিন্তু ভাঙ্গে না।

হাঁ, হাঁ, তা আছে। কিন্তু কস্তু অনেক পড়বে।

সে ভাবনা তোমার নয়। তুমি প্ল্যান কর আর সাতদিন পরে আমার সঙ্গে দেখা করো। কেমন ?

ওকামুচু চেয়ার ছেড়ে উঠল। নমস্কার করে বলল, থিক আছে, সাতদিন পরে আসব। যাবার সময় নীচু গলায় বলতে বলতে গেল, নাইস আইদিয়া ইনদিদ্।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হল কাগজে। বিজ্ঞাপনে ছিল—

গৃহনির্মাণে যুগান্তর। আপনি ফ্ল্যাটে বসে দোল খাবেন। বাতাসের সঙ্গে বাড়িও দুলবে। নতুন মজা, নতুন আনন্দ। এর নাম দেওয়া

হয়েছে 'দোদুল স্বর্গ'। আগ্রহশীল ব্যক্তি খোঁজ করুন। বক্স নং ৪২০০।

কয়েক দিনের মধ্যেই অনেকে এলেন। ব্রোণ্ডি সবার সঙ্গে কথা বলল। ছবি দেখাল। অনেকেই আগ্রহ প্রকাশ করল। কিন্তু সবচেয়ে আগ্রহ নিয়ে এল ধুধুরাম জেঠমালিয়া। ইনি নানা উপায়ে কয়েক কোটি টাকা করেছেন।

ধুধুরাম একদিন এসেছেন। প্রোফেসারের সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁর মনের মধ্যে কেবলই হচ্ছে এটা একটা নতুন লাইনের বিজনেস। কিন্তু ব্যাপারটা পরিষ্কার জানতে হবে।

একটা প্লাস্টিকের স্কেল হাতে নিয়ে প্রোফেসার ঘরে ঢুকলেন। নমস্তে, আপনি মিঃ ধুধুরাম?

জী হ্যাঁ। আপকা সাথ বাতচিত আউর পুরা আইডিয়া পাকাড়না' লিয়ে—আপ বাতাইয়ে উও বিশ-পঁচিশ তালা কোঠি দোদুল হোগা কেইসে?

প্রোফেসার হাতের স্কেলটা টেবিলে দাঁড় করালেন। বাঁ হাতে গোড়া ধরে ডান হাত দিয়ে স্কেলের মাথাটা ডান পাশে বাঁ পাশে বাঁকাতে লাগলেন। বললেন, ঐ কোঠি ঠিক এই রকম হবে। আপনি বাংলা বোঝেন ত?

হাঁ হাঁ, বিলকুল বুঝি।

দেখুন, সোজা খাড়া বাড়ি ত সবাই করছে। কিন্তু শেঠজি এটা হচ্ছে প্লাস্টিকের যুগ। আমরা এটাকে কাজে লাগাব না কেন। এমন বাড়ি আমি করতে চাই যা হাওয়ায় দুলবে। আপনি গেঁহু গাছ, ড়হর গাছ দেখেছেন?

হাঁ হাঁ, হামার জমিতেই ত আছে। মুলুকমে বিশ বিঘা জমিনমে গেঁহু হোয়।

প্রোফেসার বললেন, বাতাস হলে ঐ গাছ কেমন দোল খায় দেখেছেন? একটা সরু ডালে যখন পাখি বসে থাকে আর সেই সময় যদি বাতাস আসে তখন দুলতে দুলতে পাখির মনে কি আনন্দ হয় বুঝতে পারেন?

হাঁ, মালুম হোতা হ্যায় কি, উ ত বহুৎ খুশ হোতা।

আমি মানুষকে সেই আনন্দ দিতে চাই, সে পাবে তার ফ্ল্যাটে বসে।

হাওয়া বইবে ফ্ল্যাটও দুলবে, হাওয়া বন্ধ হবে আউর বাড়ীভি সিধে হয়ে থাকবে।

আচ্ছা জি, ভাঙ্গিয়ে পড়বে না ত? এহি ত ডর লাগতা হ্যায়। তব ত বিলকুল সব লুকশান হো যায়—

প্রোফেসার বললেন, সে চিন্তা আমিও করেছি, বুঝলেন। মোটেই ভাঙ্গবে না, ওই প্লাস্টিকের নাম হল unbreakable। যা কভি টুটবে না।

তব ত ঠিক হ্যায়। আপ প্ল্যান বানাইয়ে. ইস্টিমেট বানাইয়ে। হামি রুপেয়া দেব।

তারপর একটু নীচু গলায় শেঠজি বললেন, মেরা মতলব হায় কি, সাথ সাথ কলকাতা দিল্লী বোম্বাইমে ঐসা কোঠি বানায়েঙ্গা।

তাহলে পাকা কথা রইল, বললেন প্রোফেসার, আপনার ফোন নং আর অ্যাড্রেস দিয়ে যান।

এই লিন, লেকিন আউর দেখিয়ে, কোইকা সাথ কোথা বলবেন না। একদম প্রাইভেট রাখবেন। নমস্তে—

ধুধুরামের অন্তর্ধান হল।

কথাময়বাবু ইতিমধ্যে আরেকবার গিয়েছিলেন প্রোঃ বি ডি-র বাড়িতে। কিন্তু দেখা হয়নি। তিনি নাকি ঐ দোদুল স্বর্গ নিয়ে খুব ব্যস্ত। প্লাস্টিক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা আর ওকামুচুর সঙ্গে কাজ করছেন রাত দিন ধরে।

ব্রোঞ্চির কাছেই শুনলেন এসব। আর শুনলেন যে ধুধুরাম জেঠমালিয়া বেশ একটা মোটা অংকের চেক দিয়েছেন। তিনি ঐ পরিকল্পনার কপিরাইট লিখিয়ে নিয়েই অবশ্য দিয়েছেন। বাড়ি তৈরিও আরম্ভ হয়ে গেছে।

সেটা কোথায়?

ব্রোঞ্চি বলল, শহরের মধ্যে এখন ওঁরা করতে চান না। একটু দূরে, মানে বাটানগর ছাড়িয়ে একটা জায়গায় অনেকখানি জমি ছিল ধুধুরামের। সেই ধুধু মাঠেই এই পরিকল্পনা রূপায়িত হচ্ছে।

কতদূর কাজ হয়েছে জানেন?

ব্রোঞ্চি বলল, আমি কয়েকদিন আগে দেখে এসেছি তিনতলার মত উঠেছে।

কত উঁচু হবে বাড়িটা ? কথাময় জিগ্যেস না করে পারলেন না।

পরিকল্পনা ত অনেক, তবে আপাতত মনে হয় পাঁচ তলা পর্যন্ত উঠবে। যান না, একদিন, দেখে আসতে পারেন ত।

কথাময়ের ইচ্ছাও তাই। প্রোফেসারের দোদুল স্বর্গ দেখবেন না, এত হতেই পারে না। তাঁর গোপন ইচ্ছা, একটা উপন্যাসও লিখবেন ঐ নামে।

কিন্তু এক প্রকাশকের তাগিদে তাঁকে একটা জবর ইংরেজি বই-এর অনুবাদ করার ভার নিতে হয়েছে। তাঁর সদ্য সদ্য লেখাগুলো সোজা চলে যাচ্ছে প্রেসে। তাই তাঁকে খুবই খাটতে হচ্ছে। এই সময় শহর ছেড়ে ওরকম জায়গায় যাওয়া মানে একটা মূল্যবান দিনের অপচয়।

বই-এর কাজটা শেষ হতে প্রায় ফাল্গুনের শেষাশেষি হয়ে গেল। কথাময়বাবু দোদুল স্বর্গ অভিযানে যাবেন ঠিক করলেন। ছেলে সন্দীপ্ত ক্লাস নাইনে পড়ে। সেও বায়না ধরল সঙ্গে যাবে। সানন্দে কথাময়বাবু নিলেন তাকে সঙ্গে, ছেলেদেরই ত দেখা উচিত ঐ সব জিনিস।

অনেক খুঁজে ঠিক জায়গা বার করে হাজির হলেন পিতা-পুত্রে। দূর থেকে দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য। ঘষা কাচের মত দেয়াল দেওয়া এক সুউচ্চ গম্বুজের মত অট্টালিকা। অবশ্য ডিজাইন একেবারে আধুনিক। যেন বাক্স বসানো পায়রার খোপ। কিন্তু তার মধ্যে নতুনত্ব আছে।

আরে আপনি যে ? প্রোফেসারের চোখ পড়িল নবাগত ওদের দিকে।

হ্যাঁ, আপনার স্বর্গ দর্শনে এলাম, বললেন কথাময়বাবু।

তাই বুঝি ধোপ দুরস্ত পাঞ্জাবীর ওপর চাদরখানাও চাপিয়েছেন, খুব হাসলেন প্রোফেসার। তারপর বললেন, তবে একটা ভাল কাজ করেছেন আপনার ছেলেকে নিয়ে এসে। চলুন, আমরা ওপরে উঠে একটু দেখে আসি। তবে লিফ্‌ট হয়নি, সিঁড়ি ভেঙ্গেই উঠতে হবে।

বেশ কষ্ট করেই উঠতে হল একেবারে পাঁচ তলায়। সিঁড়ির দু'দিকে রেলিং দেওয়া।

ওপরে উঠেই কথাময়ের মনে হল যেন তিনি টলে পড়ছেন। ওকামুচু কি যেন কাজ করছিল সে তা দেখে হেসে ফেলল।

সে বলল, একটু হাওয়া হচ্ছে ত, তাতেই এতা হচ্ছে। একটু তলছে। মানে, সেন্তার অব গ্র্যাভিতি সরে যাচ্ছে কিনা।

সন্দীপ্ত বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। তার খুব মজা। সে বলল, বাবা, বাড়িটা কেমন যেন নড়ছে, তাই না? ভূমিকম্প হলে যেমন হয়। এখান থেকে দেখ কতদূর অবধি দেখা যাচ্ছে—

বাইরে গিয়ে কথাময় দেখলেন, সত্যিই অপূর্ব শোভা।

ওকাগুচু আবার সাবধান করে দিল, রেলিং ধরে থাকবেন। না হলে পড়ে যেতে পারেন। আমাদের প্রাক্‌তিস্ হয়ে গেছে কিনা তাই ধরতে হয় না।

প্রোফেসার বললেন, কেমন লাগছে বলুন।

বলবেন কি ঠিক সেই সময় একটা মেঘ যেন দক্ষিণ থেকে তাড়িঘাড়ি আসছে এদিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের হাওয়া। যাকে বলে দখিন সমীর। কথাময় দু'হাতে রেলিং ধরে আছেন। প্রোফেসার দুটো রিং-এর মধ্যে হাত গলিয়ে সোফায় বসে। আর সন্দীপ্ত জানলার গ্রীল ধরে দাঁড়িয়ে, তার কি উল্লাস।

এমন সময় ঘরটা দুলতে লাগল। যেন নৌকোর মত এদিক ওদিক হেলছে।

সন্দীপ্ত বলল, বাবা, ঠিক যেন নাগর দোলায় চড়েছি মনে হচ্ছে। কি মজা।

প্রোফেসার উচ্চহাস্যে বলে উঠলেন, দেখুন দেখুন। ইয়ং ম্যান না হলে কে এর মর্ম বুঝবে! শোনো, ওকামুচু—

তিনি ডাকলেন ওকামুচুকে। কিন্তু কোথায় সে? পরে দেখা গেল ওকামুচু রেগুলার গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেতে।

মিনিট দুই তিন পরে হাওয়া থামল। বাড়িও যেমন স্টেডি ছিল তেমনি হয়ে গেল। ওকামুচু প্যাণ্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে এসে দাঁত বার করে বলল, একতু আনমাইণ্ডফুল হয়েছিলুম কিনা তাই—

সবাই খুব হো হো করে হেসে উঠল।

নীচে নেমে শেঠজির সংগে দেখা। তিনি কি লিখছেন খাতায়। প্রোফেসার আলাপ করে দিলেন কথাময়ের সংগে।

তিনি বললেন, আপনি লিখেন বুঝি? কিতাব লিখেন?

কথাময়বাবু বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

শেঠজি বললেন, এ কোঠিটার একটা ভাল নাম করিয়ে দিন ত।

আমি ভাবছিলুম কি, 'ধুধু-সরগ' কেমন হয়? মানে হামার নামটা ভি জুড়িয়ে দিলুম।

খুব ভাল হয়, সংক্ষেপে সারলেন কথাময়।

শেঠজি বললেন, আচ্ছা, ভাবুন ত এ কোঠি যদি বিশ তলা প'চিশ তালা হয় তখন কেমন হোবে?

প্রোফেসার বললেন, আরও কল্পনা করুন, একটা শহর, যে শহরে সব কোঠিই যদি এই রকম হয়? তখন বাতাস বইলে কি হবে ভাবুন। যেমন ধানক্ষেতের ওপর ঢেউ খেলে যায়, ঠিক তেমনি হবে নাকি?

ধুধুরাম উৎসাহিত হয়ে বললেন, আরে মোসাই, ঐ ত আপনাদের কোন কবি গান বানিয়েছেন না, কোথা ধানের উপর, ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে—হ্যাঁ, মোসাই, আমি এক সাহিত্যসভাতে ওহি গান শুনিয়েছিলুম। আজও তা মনে রহিয়েছে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে এর মধ্যে।

কথাময়বাবুর বইটি প্রকাশের পর সেটি বেশ সমাদর পেয়েছিল। প্রকাশক চেপে রাখলেও কথাটা তাঁর কানে এসেছিল। তাই অন্য প্রকাশক তাঁকে আর একটি কাজের ভার দিয়েছেন। এতে প্রাপ্তিযোগের অঙ্কটা খারাপ নয়। তাই নিত্য অভাবী লেখকের পক্ষে ঐ কাজে লেগে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না তাঁর।

সুদীপ্ত অনেকবার তাড়া দেওয়া সত্ত্বেও কথাময়বাবু আর দোদুল স্বর্গে পেঁছুতে পারেননি।

হঠাৎ ব্রোঞ্চির একখানা চিঠি পেয়ে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ব্রোঞ্চি লিখেছে, ধুধুরাম শেঠজির সঙ্গে একবার দেখা করবেন। তিনি এখন উড্ ভিউ নার্সিং হোমে······

তবে কি শেঠজি অসুস্থ?

একদিন বেরিয়ে পড়লেন কথাময়বাবু! খুঁজে খুঁজে পাওয়া গেল ঠিকই। সত্যিই শেঠজি এক পেশাণ্টের বেডে।

কি হল তাঁর? নিশ্চয়ই হার্ট অ্যাটাক?

শেঠজি ঘুমুচ্ছিলেন। পাশে বসা একটি ফুটফুটে তরুণীর দিকে চোখ পড়ল কথাময়ের। শেঠজির মেয়ে কি?

মেয়েটি নিজেই কথা বলল, আপনিই কথাময়বাবু?

হ্যাঁ, কি হয়েছে শেঠজির ?

পিতাজি এখন ঘুমুচ্ছেন। ওঁকে ডিসটার্ব করা উচিত নয়। চলুন আমরা যাই ঐ করিডরে—

দুজনে নিঃশব্দে করিডরে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি বলল, ব্যাপারটা আপনাকে ছোট করে বলছি, পিতাজি ঐ নতুন দোদুল কোঠিতে গিয়ে দু'দিন ছিলেন। আমি মা কেউ যাইনি। শুধু ধনিয়া আমাদের চাকর সে ছিল। সেই সময় ১৭ তারিখে একদিন ঝড় হয়েছিল। বৈশাখ মাসে ত হয় এরকম। তখন কোঠিটা ভীষণ দুলছিল, তারই ফলে খেতে খেতে পিতাজি চেয়ার থেকে পড়ে যান, আর মেঝেতে গড়াতে থাকেন—

ডাক্তার কি বলছেন এখন ? কথাময় আর থাকতে পারেন না।

না, ডাক্তারবাবু বলেছেন, বিশেষ কিছুই হয়নি। শুধু একটা শক্ লেগে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কথাময়বাবুর বুকের বোঝাটা যেন নেমে গেল। কিন্তু তা হোক একটা অদম্য কৌতূহল তাঁকে ঠেলে নিয়ে গেল প্রোফেসারের বাড়িতে। প্রোফেসার নেই। তাঁর সঙ্গে দেখা হল না।

ব্রোঞ্চিই কথা বলছিল।

দেখে এলেন শেঠজিকে ? বলল ব্রোঞ্চি।

হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন ত ? কি হয়েছিল ?

এমন কিছু নয়, কিন্তু শেঠজি নাকি প্রোফেসারের বিরুদ্ধে ড্যামেজ সুট করবেন বলেছেন। অথচ শেঠজি যে সব ফার্নিচার নিয়ে ছিলেন ঐ পাঁচতলায় সেগুলো নিয়মমত দেয়ালে ফিক্‌স করা হয়নি। এটা ত তাঁরই গলতি—

তারপর ?

শেঠজি তখন নাকি খাচ্ছিলেন। হাওয়া জোর বইতে থাকে। বাড়ি দুলতে থাকে। শেঠজির টেবিল কাত হল আর উনিও পপাত ধরণীতলে। তারপর নাকি খুব গড়িয়েছেন। তার ফলেই শরীর খারাপ আর স্যারকে ভয় দেখিয়েছেন। কিন্তু সেদিন নাকি উৎসব লেগে গিয়েছিল নীচে।

কেন ? কেন ? কথাময়ের উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন।

শেঠজি চাকর সমেত যখন যান প্রচুর খাবার নিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলো ছিল তাকের ওপর, কিছু ছিল টেবিলে। ভৃত্য ধনিয়া মজা

পেয়ে দুলতে দুলতে জানালা বন্ধ করতে ভুলে যায়। আর তারই ফলে সেই খোলা জানালা দিয়ে নীচে হল লাড্ডু বৃষ্টি।

অ্যাঁ, বলেন কি? বেশ মজার খবর ত।

হ্যাঁ, লোকে লোকারণ্য। সবাই নাকি প্রচুর লাড্ডু আর ঘৃতপক্ক কচুরি কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়েছে। তারপর থেকে রোজই ভিড় জমে। এখন নাকি সেখানে চায়ের দোকানও বসে গেছে।

আচ্ছা! স্যারের খবর কি, তাই বলুন।

স্যার এখন অন্য জগতে। তিনি এক এঞ্জেল মাছ নিয়ে পড়েছেন। ফ্রিজের মধ্যে রেখে তার রক্ত পরীক্ষা করছেন।

কথাময়বাবু আবার ভবিষ্যতের আর এক নতুন গল্পের প্লটের আশা নিয়ে বাসে চেপে বাড়িমুখো হলেন।

বাড়ি গিয়েই খবরটা গুছিয়ে বলতে হবে সুদীপ্তকে।

কেউ কি কখনও দেখেছে কোনও বিজ্ঞানীকে বাজারে যেতে ?

প্রোফেসার বুদ্ধিধরকে কিন্তু একদিন যেতে হয়েছিল।

হ্যাঁ, সেই প্রোঃ বুদ্ধিধর দি গ্রেট, যিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন বিজ্ঞান সাধনায়, যাঁর আবিষ্কৃত বিকর্ষণ-বটিকার কাহিনী লোকের প্রায় মুখে মুখে।

প্রোফেসার বলেন, শপিং করতে মেয়েরাই যায়। তাছাড়া আমি দেখেছি, বাজার করতে গেলে অনেক সময় ঠিক দরকারের মুহূর্তে ব্যাগ বা থলিটাই খুঁজে পাওয়া যায় না। কেমন করে যেন বেপাত্তা হয়ে যায়। সে রহস্য ভেদ করা শক্ত।

সত্যিই তাই, কেনাকাটা করতে গিয়ে তিনি দু'বার তাঁর পার্স হারিয়েছেন আর তেরোটা ছাতা তাঁর জিম্মা থেকে বেহাত হয়ে গেছে।

যাই হোক, বাধ্য হয়েই সেদিন তাঁকে বাজারে যেতে হয়েছিল সামান্য কিছু তরকারি আর মাছ আনতে, কেননা সেদিন তার সহকারী রোণ্টি সকালে ছুটী নিয়েছিল।

ব্রেকফাস্ট সেরে, চিঠিপত্র আর খবরের কাগজগুলো পড়ে, চুরুট ধরিয়ে, যখন তিনি বাজারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন তখন অবশ্য মাত্র প্রায় এগারোটা বাজে।

এখন, শহরের বাজারে এগারোটায় ভাঙ্গা বাজার। কানা বেগুন,

পচা কুমড়ো, গলা টমাটো উচ্ছিষ্টের মত অবশিষ্ট পড়ে থাকে। মাছের বাজারে ঢুকে তিনি আরো অবাক হয়ে গেলেন।

কিছু কিছু সামুদ্রিক পচা মাছ, চুনোপুঁটি আর কাঁটাবহুল কুঁচো ট্যাংরা ছাড়া আর প্রায় কিছুই চোখে পড়ে না। বড় মাছের এলাকায় গিয়ে তিনি আরও তাজ্জব হলেন। কাটাকুটির পরে হতাহত সৈনিকের মত তাদের দেহহীন মুড়ো, ল্যাজা আর পোঁটাগুলোই অবশিষ্ট পড়ে আছে। মাছে কিন্তু রক্তের লালিমা।

দুষ্টারি ! ব্রোঞ্চি আজ আমাকে সত্যিই বিপদে ফেলেছে ! এবম্বিধ চিন্তা করে কাটামুণ্ডদের ত্যাগ করে আর ব্রোঞ্চির মুণ্ডপাত করতে করতে কিঞ্চিৎ চুনো মৌরলা সংগ্রহ করে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

বাড়িতে এসে মাছগুলো একটা প্লেটে রেখে এক কাপ কফি পান করতে করতে মৌরালাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এত ছোট মাছ লোকে ধরে কেন ?

পরক্ষণেই মনে পড়ল, কতক মাছ যে ছোটই থেকে যায়। তাদের নাবালকত্ব ইহজীবনে আর ঘোচে না। তাই কি ?

কিন্তু কেন ?

একটা নাতিবৃহৎ একোয়ারিয়ামের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই চোখে পড়ল সাবলীল ভঙ্গিতে গোল্ড ফিস দু'টো জলের এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনটে এঞ্জেল অতিবিজ্ঞের মত সাবধানে নড়াচড়া করছে তাদেরই পাশ কাটিয়ে।

কিন্তু ঐ ছোট মাছগুলো ? ক্ষুদ্রতম জীবনের কণিকাগুলো ? ওরাও ছুটোছুটি করছে। নির্ভয়ে নিশ্চয়ই নয়। ওদের মধ্যে আছে ফাইটার, আছে গাপ্পি। গাপ্পির চেহারা ছোট, আবার নামটাও ছোট। আহা, বেচারা !

প্রোফেসারের চোখে বেদনার ছায়া নেমে আসে যেন। ঐ ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে ওর মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও অন্ত্রাদি সবই আছে। কিন্তু বাড়াতে ওর আপত্তি কিসের ? ও কি এঞ্জেলের সমকক্ষ হতে পারে না ? ওর কি সাধ যায় না গোল্ডফিসদের মত বিপুলকায় হতে ? ছোটরা সংসারে চিরকালই তুচ্ছ। তাদের বরাতে জোটে অবজ্ঞা আর উপেক্ষা। কেই বা তাদের সম্মান দিচ্ছে।

প্রোফেসার একটু হেসে উঠলেন। ভাবলেন, আমি কি সাহিত্যিক হয়ে যাচ্ছি নাকি ? কিংবা কম্যুনিস্ট ? কম্যুনিস্টরা ছোটকে বড় করে, আবার বড়কে ছোট করে। মানুষের অবিচার তারা সহ্য করতে চায় না।

কিন্তু বিজ্ঞান ? বিজ্ঞান প্রকৃতির অবিচার সহ্য করতে নারাজ। না, কিছুতেই না। প্রকৃতি তার বদান্যতার কিই বা আমাদের দিয়েছে ? তার ভাঁড়ারে সব সময়ই ঝুলছে চাবি-তালা। বিজ্ঞান কিন্তু বলছে, দাঁড়াও, তোমার ভাঁড়ারে ঢুকে আমার যা দরকার নিয়ে নেব। নিলও তাই। জল ফুটলে স্টিম হয়। কেউ জানত কি যে স্টিম দিয়ে কাজ

করানো যাবে ? তিরিশখানা বগির একটা মস্ত ট্রেন টানবে সে ? সত্যিই বাহাদুর বিজ্ঞান !

আরে—আরে ! মাছগুলো খেয়ে গেল যে ! এই রামখেলন—

কিসু বলসেন বাবু ? প্রোফেসারের পাচক রামখেলন ছুটে এসে দাঁড়াল।

আর বলছি কি, ঐ মাছগুলো সব শেষ করল যে—

কৌন বাবু ?

ওই নেপচুনটা, আবার কে ?

প্রোফেসারের পোষা বিড়ালের নাম নেপচুন।

এমন সময় ব্রোণ্ডি এসে ঢুকল। দেখেই প্রোফেসার রাগে ফেটে পড়লেন। না, রাগলেন কিন্তু ফাটলেন না। তিনি সব সময় নিজেকে সংযত রেখে কথা বলেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানীদের রাগলে চলবে না। দুঃখেও ভেঙ্গে পড়লে কি চলে ? তাকে যে বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম সূত্র ধরে এগুতে হবে। মাথাটি ঠাণ্ডা চাই।

তুমি আজ সকালে না এসে কি অঘটন ঘটালে, জানো ব্রোণ্ডি ! বললেন তিনি।

কি হল স্যার ?

আরে মাছ, মাছ—মাছ খেয়ে গেল নেপচুনটা। না, এটাকে অঘটনই বা বলছি কেন ? একটা সূত্রও ত পেয়ে গেলুম এখান থেকে।

কিসের স্যার ?

গাম্প, গাম্প।

ব্রোণ্ডি আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকে।

শোন, কস্‌মোনাটদের খাদ্যের জন্যে ওরা যে কনসেন্‌ট্রেটেড্‌ ফুড ট্যাবলেট বানিয়েছিল তার ফর্মুলাটা জোগাড় করতে হবে। আর ওয়েল্‌স্‌ সায়েবের 'ফুড অব্‌ দি গড্‌স' বই-এ ফুড সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দেওয়া আছে সেগুলো আমার চাই।

ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না স্যার, আপনি কি কোনও বিশেষ ফুড নিয়ে কাজ—

হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বুঝতে পাচ্ছ না ? আমি চাই একটা ফুড যা প্রাণীর গ্রোথকে অবাধ করে দেবে। মানে, তার চেহারা বড় হতে থাকবে—বুঝলে ? এটা আর গল্প থাকবে না, সত্যি হয়ে উঠবে।

কার জন্যে ওটা করবেন স্যার ?

আহা, বোকার মত প্রশ্ন কর না। ওই একোয়ারিয়ামে গাপ্পিগুলোকে দেখেছ ? ক্ষুদে ক্ষুদে চেহারা ? বেচারারা কি আর বাড়বে না ? কেন বাড়বে না, বাড়তে দোষটা কি ? বাধাটা কোথায় ? এ নিয়ে তোমার মনে প্রশ্ন আসে নি কোনোদিন ?

না স্যার। ওদের বড় হবার একটা লিমিট আছে যে !

আহ্‌হা ! সেই লিমিটই আমি ভাঙ্গতে যাচ্ছি, বুঝলে না ?

পারবেন ?

বিজ্ঞান কি পারে না বলত ?

এর পর প্রোফেসার বুদ্ধিধর গবেষণা চালালেন সাড়ে তিন মাস ধরে। নানান প্রোটিন আর বহু ভিটামিন আর অ্যালকলয়েড নিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম। নতুন অনেক তথ্যও আবিষ্কৃত হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে।

খাদ্য তৈরি হল দানাওলা গুঁড়ো হিসেবে। একোয়ারিয়ামে ছাড়া হল। ফুটো-দেওয়া পাত্র থেকে যাতে মাছেরা খেতে পারবে।

এই সময় হঠাৎ সর্দি আর ফ্লু জ্বরে প্রোফেসার কাবু হয়ে পড়লেন। প্রায় শয্যাগত। ব্রোণ্ডিও অন্য কাজে ব্যস্ত। একোয়ারিয়ামের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় হয় নি কারুর।

সপ্তম দিনে অন্য কথার পর ব্রোণ্ডি বলল, স্যার, একোয়ারিয়ামে মাছ নেই ত !

সে কি ? চশমা কপালে তুলে প্রোফেসার তাকালেন। এ আবার হতে পারে নাকি ? দেখ ভাল করে। দেখ তাদের চেহারা বেড়েছে কিনা—

না, স্যার, খুঁজে দেখেছি। একটাও মাছ নেই। মারা পড়লেও ত ডেড বডিগুলো থাকবে ! তাও নেই।

তা হলে কি হতে পারে ? তুমি ত আমাকে ভাবিয়ে তুললে হে ! রামখেলনকে জিগ্যেস করেছ ? সে কিছু জানে কি ?

রামখেলন বললে, যে সে দরজা খুলতেই কি যেন একটা লাফিয়ে বাইরে গেল। সেটা মাছও হতে পারে, ব্যাঙও হতে পারে। তারপরই নেপচুনের আওয়াজ পেয়েছিল সে। বেশ খুশির আওয়াজ নেপচুনের। খাদ্য পেলে যেমন হয়।

ব্যাপারটা বড় রহস্যময় লাগছে,—বললেন প্রোফেসার। তা হলে কি একোয়ারিয়াম থেকে লাফ দিয়ে নীচে নামল ? কিন্তু অন্য মাছগুলো ? সেগুলো কি বৃহত্তরটির পেটে গেল ? বড় গোলমেলে ব্যাপার ! তবে খোলা ঢাকনা পেয়ে একোয়ারিয়াম থেকে যে পালিয়েছে এটাই সম্ভব মনে হচ্ছে। আর যখন পালিয়েছে, তখন আকারে নিশ্চয়ই বেড়েছিল।

হ্যাঁ স্যার, আমারও তাই মনে হয়।

দেখ ব্রোণ্টি, এই খাদ্যটাকে আলাদা করে একটা প্যাকেট বানাও। এটার নাম দাও ফিস ফুড ওয়ান, সংক্ষেপে 'ফি-ফু-ওয়ান'। তারপর এর সঙ্গে প্ল্যানডিন মেশাও, নাম দাও 'ফি-ফু-টু'। আরো ডোজ বাড়িয়ে 'ফি-ফু-থ্রি'। এই স্যাম্পলগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে। বুঝেছ ?

হ্যাঁ স্যার !

হুঁ, দেশে শুনি মাছের সমস্যা। মাছ পাওয়া যায় না। আরে, বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হতে ক্ষতি কি ? ছোট মাছকে বড় করে দিলে সমস্যাটা আর থাকছে কোথায় ? থাক না মানুষ কত খাবে ! একটা পুঁটিমাছকে যদি দেড় কেজি করা যায়, কেমন হবে ?

ব্রোণ্টি বিনীতভাবে বলল,—একোয়ারিয়ামে এত বড় মাছ ধরবে না স্যার !

রাইট ! আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম। এখন চৌবাচ্চা চাই। বেশ বড়-সড় চৌবাচ্চা। আর তারপর পুকুর।

তারপর নদী, বলল ব্রোণ্টি, আর তারপর সমুদ্র।

রাইট !

আমাদের পাড়ার কুদন্তবাবুর বাড়িতে একটা চৌবাচ্চা আছে স্যার !

কে কুদন্তবাবু ?

কুদন্ত ভটচাজ, আই বি বিভাগে কাজ করেন। ঘরে তিলাপিয়া চাষের শখ, বাড়িতে মাছ পোষেন একটা বিরাট চৌবাচ্চায়।

তুমি খবর নাও, কি মাছ আছে। গোপনে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। দেখাই যাক না অন্য মাছের ওপর কি অ্যাকশান হয়।

মাছকে খেতে দিতে চৌবাচ্চায় কি দিস রে ? কুদন্তবাবুর ছেলেকে জিগ্যেস করে ব্রোণ্টি।

কেন, ভাত দিই, মুড়িও খায়। বলল ফুচুন।

আচ্ছা, এই খাবারটা দিস ত, মাছেরা খুব ভালবাসে এটা। অন্য খাবারের সঙ্গে এটা মিশিয়ে দিবি। এই বলে ফুচুনের হাতে 'ফি-ফু-থিং' একটা প্যাকেট দিয়ে এল ব্রোঞ্চি।

—এটা খেলে মরবে না ত?

—নারে না।

তারপর ওদের সঙ্গে কিছুদিন আর কোনো যোগাযোগ নেই।

কৃদন্তর পিসীর ভীষণ শুচিবাই। তিনি পারতপক্ষে চৌবাচ্চার কাছে যান না। চৌবাচ্চার জল গায়ে লেগেছে সন্দেহ হলেই তাঁকে চান করতে হয়।

একদিন পিসী বলে উঠলেন, চৌবাচ্চায় মাছটাছ রাখা চলবে না বাপু! বামুনের বাড়ি, একি এ মেলেচ্ছপনা! চলবে না এসব, তা বলে দিচ্ছি, বুঝলি!

কেন, কি হল ঠাকমা? ফুচুন বলে।

হবে আবার কি? চৌবাচ্চার কাছে কেন মরতে যে গেছলুম, আর অমনি একটা মাছ এমন ঘাই মারল, ও বাবা! আমার গায়ে আঁসটে জল ছিটিয়ে পড়ল গা! কাপড়টা ভিজে সপ্‌সপে। ফের আমায় চান করতে হবে। কি জ্বালা দেখতো!

ফুচুন ত হেসেই অস্থির।

ঘাই মারল ঠাক্‌মা? ঘাই মানে কি?

আহা! আর আদিখ্যেতা করতে হবে না। মাছেরা ল্যাজ ঝাপ্টা মারে দেখিস নি? কি মাছ আছে র‍্যা ওই চৌবাচ্চায়? জেলে-দুলেরাও ঘরের মধ্যে মাছ পোষে না। ছি ছি ছি—ধম্মো-টমমো আর রইল না কিছু।

কৃদন্তবাবু ছুটে এলেন। কি ব্যাপার পিসী, আজ আবার তোমার হ'ল কি?

হবে আবার কি! তোদের মেলেচ্ছপনায় আমায় আর থাকতে দিবি না বাড়িতে। কবে যে বিশ্বনাথ টানবেন আমাকে জানি না। দে না, কান্ত, আমাকে কাশী পাঠিয়ে—

আহা, কাশী বিশ্বনাথ ত আর পালাচ্ছে না। কি হ'ল তাই শুনি আগে।

কাশীতে কি আবার আছে জ্ঞান ঠাকুমা ?' ফুচুন বলে।—বাঁদর'। তারা যে তোমার আঁচল ধরে টানবে !

থাম তুই। পিসী এক ধমক দেন।

হ্যাঁ গো, সত্যি।

—বাঁদরের গায়ে ত আঁশ নেই। ছুঁলে দোষটা কি ? আহা তীর্থের জীব, তাদের আবার ভয় কি র‍্যা ? দু'টো নাড়ু ফেলে দিলে কী খুশি হয়ে চলে যায়, জানিস ?

কৃদন্তবাবুকে আপিসের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে, তাই পিসীর সঙ্গে কথা না বাড়িয়ে তাঁকে শান্ত করতে বললেন, বেশ ত, পুজোর সময় আমরা সবাই যাব কাশীতে,—কেমন, হ'ল ত ?

পুজোর সময় ? পিসী ফেটে পড়েন।—সে ত অনেক দেরী রে ! এই ত সবে আষাঢ় মাস—শোন কথা !

আর ছোড়দির বিয়ের সময় থাকবে না তুমি ?—ফুচুনের প্রশ্ন।

তা আর থাকব না ! রুমার বিয়েটা দেখব বৈকি। তা তখন আমায় নিয়ে আসবি আবার।—জানিস কান্ত, রুমাকে একজোড়া বাউটি গড়িয়ে দে, অমন গোলগাল হাতগুলো, বেশ মানাবে—

আচ্ছা, সে সব হবে'খন, কৃদন্তবাবু মাঝখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানেন। আমার আর দেরী করলে চলবে না, তুমি যাও।—বলেই তিনি বেরিয়ে যান।

পিসী বললেন, যাই, আর একবার চান করতে হবে ত ! অ বৌমা, কলঘরে কেউ আছে নাকি গা ?

ফুচুনের সন্দেহ যায় না। সে ভাবল, ঠাকুমা চৌবাচ্চায় মাছের কথা কি সব বলছিল না ! একবার দেখলে হয় না ?

সে চৌবাচ্চার কাছে গেল। বেশ বড় চৌবাচ্চা। সিঁড়ির নীচে বলে অন্ধকার। জলটা কালোমত দেখাচ্ছে। সে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কই, কোনো মাছ ত ঘাই মারছে না ! ক'দিন হ'ল মাছও ধরা হয় নি এ থেকে।

হঠাৎ কি একটা চোখে পড়ল তার জলের মধ্যে। একটা যেন কিসের মুখ। হাতের চেটোর মত, দু'পাশে শুঁয়ো শুঁয়ো রয়েছে। ও মা, ওটা কি ? মুখটা ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে একটা ফুট গালল, আবার নেমে গেল।

ফুচুন ভয়ে সরে যায়।

মাকে গিয়ে সে বলল, চৌবাচ্চায় একটা ভোঁদড় না কি ঢুকেছে মা! এই, এত বড় মুখখানা!

মা বললেন, যাহ্, তুই ভুল দেখেছিস। এখানে ভোঁদড় আসবে কোত্থেকে? জলের মধ্যে জিনিসকে বড় দেখায়, বাঁকাচোরা দেখায় রে! এবার একদিন তিলাপিয়া মাছগুলো ধরতে হবে।

ফুচুনের সন্দেহ কিন্তু গেল না। সে মাঝে মাঝে চৌবাচ্চার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে যখন খাবার দিতে যায়। গভীর কালো জলের মধ্যে একটা মাছও সে দেখতে পায় না। নিজেই ভাবে, মাছগুলো গেল কোথায়? আশ্চর্য!

সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি।

ফুচুনদের বাড়ির পাশে খানিকটা খালি জমি পড়ে আছে। কারা যেন কিনে ফেলে রেখে দিয়েছে। বাড়ি তৈরি করবে বলে গোটা দুই লম্বা ভিতও কেটে রেখেছে। বৃষ্টির জলে সেগুলো ভর্তি হয়ে টইটুম্বুর। তার আশপাশে লম্বা ঘাস আর কালকাশুন্দে গাছে ভরে গেছে জমিটা।

বৃষ্টি থেমে যেতে বাচ্চারা বেরিয়েছে। জলে কেউ কাগজের নৌকো ভাসাচ্ছে, কেউ বা ঘাসের মধ্যে ব্যাঙদের তাড়া করছে।

হঠাৎ এমন সময় নান্টু চেঁচিয়ে উঠল, গেলুম, গেলুম!

সবাই ছুটে এলে দেখে নান্টু সেই ভিতের খাদের মধ্যে নেমে যাচ্ছে আর চীৎকার করছে।

কি হ'ল? কি হ'ল?

পাড়ার লোকজন ছুটে এল। নান্টুর বাবা হারু মল্লিক টিম্বার মার্চেন্ট। তিনি হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

ছেলেকে তোল জল থেকে—ধমক দিলেন রঘুয়াকে। রঘুয়া কিন্তু অনেক টানাটানি করে তুলতে পাচ্ছে না।

কী আশ্চর্য! রোগাটা দেখতেই ধুমসো, গায়ে যদি এক কড়ার শক্তি থাকতে হয়! ওপরে দাঁড়িয়ে হারু মল্লিক ডাক ছাড়েন।

ঠিক সেই সময় কুন্দশতবাবুও জীপ নিয়ে ফিরলেন। সঙ্গে একজন সেপাই। জীপ থামতে সেপাইজী গাড়ি থেকে নেমে অকুস্থলে এল।

বংগালি আদমিকো কাম নেহি—বলে সে পাঁজাকোলা করে ধরল নান্টুকে।

তারপরেই হুম্ বলে হুংকার ছাড়ল। তুলতে চায়, কিন্তু ওঠে না।

কেয়া হুয়া সিপাইজী?

বড়ি জোর সাঁটল বা—মুখ বিকৃত করে বলে ওঠে সে। মালুম হ্যায় কি, কোই জাঁতিয়া কলমে সাঁট গই—

আরে দূর! নান্টুর বাবা হারু মল্লিক আস্তিন গুটিয়ে তেড়ে এলেন। একটা ছেলেকে তুলতে হিমসিম খাচ্ছে ওরা! কী আশ্চর্য!

নান্টু সমানে চীৎকার করে যাচ্ছে, উঃ, ভীষণ লাগছে। কি কামড়েছে আমায়, আমার পায়ে—

ঘোলা জলের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না কিছু। কি করা যায়?

অবশেষে কৃদন্তবাবু আর দু'-তিন জন নেমে পড়েন জলের মধ্যে।

কৃদন্তবাবুর পায়ে জুতো ছিল তাই কিছু বুঝতে পারলেন না, কিন্তু আর একজন হাউমাউ করে লাফিয়ে উঠে পড়ল জল থেকে। বলল, জলের মধ্যে সাপ নাকি? গাটা হড়হড়ে, পা পড়তেই স্লিপ করে যাচ্ছে—

নান্টুর পায়ের নীচের দিকে হাত দিতে বোঝা গেল জাঁতিকলের মত একটা জানোয়ার যেন পা-টা কামড়ে আছে।

হারু মল্লিক বললেন, জল ছেঁচে ফেল। কুইক! কুইক! এক মুহূর্ত দেরী নয়। নিয়ে আয় বালতি, হাঁড়ি, কলসী—

বালতি বালতি জল উঠতে লাগল।

জল কমতে সিপাইজী দেখল নান্টুর পা কামড়ে আছে একটা বিরাট মুখ, যেন সিন্ধুঘোটকের মত।

সে দাপাদাপি শুরু করল।—আরে বাপ্, ইয়ে বাঘ হ্যায় কি কুম্ভীর হোয়, মেরা জান লে লেগা। ম্যায় পকড়নে নেই সেকবে—হা রামজী।

কৃদন্তবাবু ধমক দিয়ে বললেন, কি হচ্ছে মিশির! দাঁড়াও. ভয় নেই, আমি বন্দুকটা বার করছি।

সাঁত্যই তিনি গানটা বার করলেন। এদিকে আরো জল কমতে দেখা গেল ইঞ্চি বারো চওড়া কালো একটা মাথা, দড়ির মত গোঁফ ঝুলছে। সর্বাঙ্গ জলের তলায়, শুধু মাথাটা দেখা গেল।

এ কি কোনো জন্তু? না মাছ? সবাই বলে ওঠে।

মাথা থেকে কিছুটা নীচে হিসেব করে তাক করলেন কুদন্তবাবু, তারপরে ট্রিগার টিপলেন—গুড়ুম্ !

অব্যর্থ লক্ষ্য। নান্টুর পা মুক্ত হ'ল। কিন্তু সেই কাদাজলের মধ্যে সে কী দাপাদাপি, কী আলোড়ন !

নান্টুকে নিয়ে ওর বাবা ছুটলেন হাসপাতালে।

কুদন্তবাবু বললেন, জলদি পানি উঠাও !

এর মধ্যে উচ্চ কলরবে আর গুলির আওয়াজে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়ে গেছে সেখানে।

শেষে অনেক কষ্টে জীবটিকে দাঁড়ির ফাঁস লাগিয়ে বাঁশে বেঁধে ওপরে তোলা হ'ল। তার আগেও বার কয়েক ফাঁস থেকে গলে সে পড়ে গেছে। কেননা গুলিতে ওর বোধ হয় কিছুই হয় নি। ডাঙ্গায় উঠেই ও ছুটতে লাগল এঁকেবেঁকে জলে-ভেজা ঘাসের মধ্যে। বিরাট একটি জীব।

যখন ওপরে উঠল তখনও কেউ নিঃসন্দেহ হতে পারে নি ওটা কি। কেউ বলে সাপ, কেউ বলে মাছ, কেউ বলে সামুদ্রিক জীব।

শেষে বেশির ভাগ লোক অনেক পর্যবেক্ষণের পর রায় দিল ওটা মাগুর জাতীয় মাছ।

আর একটা ফায়ার করবেন বলে কুদন্তবাবু উশখুশ করছিলেন। যখন গরুর দাঁড়ি দিয়ে মাথার দিকটা বাঁধা হয়েছে তখন তিনি তাক করলেন। ফুচুন গিয়ে ধরল, বাবা, মের না। তার চেয়ে বেঁধে রাখ—

বলছিস কি ! নরখাদককে মারব না ?

বলেই তিনি ট্রিগার টিপলেন। মাথাটা গুঁড়িয়ে গেল আর অমনি ওর নড়াচড়া বন্ধ হ'ল।

এবার ওকে টান করে শুইয়ে মাপা হ'ল ফিতে দিয়ে। হ'ল সাড়ে ন' ফুট।

পাড়ার লোক চোখ কপালে তুলে বলল, আই শ্বাস্ ! একটা মাগুর মাছ ছ'হাতের বেশি লম্বা ! ওজনে কত হবে কে জানে ?

কুদন্তবাবু বললেন, কেউ কিছু কর না, আমি আগে পুলিশে ফোন করছি। যা করবার ওঁরাই করুন। কাগজের রিপোর্টারকেও একটা খবর দেওয়া দরকার। ওঁরা ক্যামেরা নিয়ে চলে আসুন। আহা, গুলি করবার সময়টায় ছবি তুললে খুব ভাল হ'ত। যাক, কি আর হবে।

ফুচুন যেতে যেতে বললে, দেখ বাবা, ঐ মাছটাই বোধহয় আমাদের চৌবাচ্চায় ছিল।

যাহ্, তা কি করে হবে? পাগলের মত এ কথা তোর মনে হল কেন রে?

ফুচুন বললে, ওর মুখটা যেন চেনা চেনা লাগছে। আমি একদিন ঐ রকম একটা মুখ চৌবাচ্চার মধ্যে উঠতে দেখেছিলুম।

তারপর?

আমার ভয় হয়ে গেল। আমি সরে গেলুম। আর কিচ্ছু দেখিনি। কিন্তু আমাদের চৌবাচ্চায় একটাও মাছ নেই, দেখেছ? এক গাদা তিল্যাপিয়া মাছ ছিল ত!

তাই নাকি? আমি ত এসব জানি না! কিন্তু ঐ দশাসই মাছ আমাদের চৌবাচ্চায় এল কোত্থেকে? আর সেখান থেকে এখানেই বা আসবে কি করে?

ফুচুন উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু তার মনে হয় ঐটাই ছিল তাদের চৌবাচ্চায় আর সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে। তার দুঃখু, ছোটদের কথায় কেউই ত গুরুত্ব দেয় না। তাই সে উত্তর দেয় না।

উত্তর দিতে পারে হয়ত একমাত্র ব্রোঞ্চি।

বটুকদা একদিন পথে ধরলেন ব্রোঞ্চিকে।

কই, মিঃ ব্রোঞ্চি, বাজারে ত মাছ সস্তা হ'ল না! মাছ নিয়ে প্রোফেসার সাহেব যে এক্সপেরিমেন্ট করছিলেন। আমরা ত আশায় ছিলুম মাছ সস্তা হবে। জলের দামে মাছ কিনব। কিন্তু—

ব্রোঞ্চি বলল, দেখুন, আপনাদের দুর্ভাগ্য, আর তার চেয়ে বেশি দুর্ভাগ্য মাছেদের। তারা ক্ষুদ্রতা ছেড়ে একটু বৃহত্তর হতে পারত। সহজেই হতে পারত। দেখলেন না ঐ বোষ্টমপাড়ার বিশালকায় মাগুরের কাণ্ড?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ও ব্যাপারটা কি বলুন ত? কোত্থেকে এল ঐ দৈত্য মাছ? ব্যাপারটা রিয়ালি কৌতূহলোদ্দীপক, তাই না? কিন্তু কোন ক্লু পাওয়া গেল না। আমায় নাকি বিশ্বাস করতে হবে বৃষ্টির সময় উনি আকাশ থেকে পড়েছেন?—অ্যাবসার্ড!

হিয়া হিয়া করে খুব হেসে উঠল ব্রোঞ্চি।

হাস্যকর মশাই, সব হাস্যকর। এদিকে দেখুন, ফচুনকে আমি দিয়েছিলুম 'ফি-ফু-থি:'। সে কথা কারুর মনে নেই। আর চৌবাচ্চায় ওদের একটা যে মাগুর মাছ ছিল তাও ভুলে গেছে, আর ঐ তিলাপিয়া-ঝাঁকের অদৃশ্য হওয়াটা যে ঐ রাঘব বোয়ালের পেটে যাওয়া এ যুক্তি কারুর মাথায় আসছে না। তাছাড়া বৃষ্টির দিনে চৌবাচ্চা পরিপূর্ণ ছিল বলেই ওই বিশালবপু মাগুর সহজেই নীচে নেমেছে এবং খোলা দরজা পেয়ে রাতভোর বৃষ্টির মধ্যে উন্মুক্ত বোষ্টমপাড়ার পোড়ো জমিতে আড্ডা গেড়েছে এ কথাও কেউ ভাবতে পারছে কি ?

বাঃ বাঃ, এ ত খুব লজিক্যাল কথা বললেন! তা হলে ত প্রোফেসারের ফুড গবেষণা সাক্‌সেসফুল—বটুকদা'র উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ।

চুপ চুপ চুপ! ব্রোণ্টি যেন বেশ শঙ্কিত।—ও সব যা বললুম এ শুধু আপনি বলেই। আপনি ত আর পাব্‌লিক ন'ন। স্যার বলেছেন, এ সব গুহ্য রাখতে। ক্লোজ্‌ড সিক্রেট। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয় ত—

তা ঠিক। ব্যাপারটা মারাত্মক হবার দিকে ঝুঁকেছিল। না হলে গাম্পি কিনা গুরুতর হয়ে মাগুর হয়ে ওঠে! যাক, নান্টু এখন ভাল আছে। হ্যাঁ, এখন প্রোফেসার সাহেব এটার সম্বন্ধে আর কিছু ভাবছেন নাকি ?

বাপোঃ! তিনি আছেন অন্য জগতে।

মানে ?

তিনি এখন চিন্তার ওয়েভ-লেংথ কষছেন। সেখানে, মানে, তাঁর ঘরে ঢুকতে দেন না কাউকে।

তা দিয়ে হবে কি ?

আরে মশায়, এটা সফল হলে একজনের চিন্তাটা আরেকজনের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মানে, ওই যে যাকে বলে থট্ রীড্ করা ?

বাঃ, এই ত, আপনি রীড্ করে ফেলেছেন। আচ্ছা, চলি—মনে থাকবে ? কথাটা বুঝতে পেরেছেন ?

ও হ্যাঁ, বুঝেছি।

বটুকদা পা চালিয়ে পথ ধরলেন।

॥ এক ॥

কাল রাতে ঘুমিয়েছিলেন, স্যার ? বিনীতভাবে বলল রোণ্টি।

কেন বলত ? রেঞ্চ নিয়ে একটা নাট আঁটতে আঁটতে প্রোঃ বি, ডি, বলে ফেললেন।

কেন, মানে, আমি একবার রাত একটার সময় উঠে দেখি তখনও আপনি কাজ করছেন। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, আর লক্ষ্য রাখতে পারিনি, রোণ্টি বলে চলল। ভোর পাঁচটায় উঠে দেখি আপনি ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে আছেন—মনে হল, কি যেন ভাবছেন। তাই জিগ্যেস করছি কাল বোধহয় ঘুম হয়নি।

ধন্যবাদ রোণ্টি, তুমি আমার জন্যে একটু যে ভাবো এ সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। ব্যাপারটা কি জান, ১৩ তারিখ থেকে আজ ২৪ তারিখ, মানে এই ১২ দিন আমার ঐ ভাবেই কাটছে। আরে, ঘুম ত সবাই ঘুমোয়। জীবনের অর্ধেকটা আমরা নাক ডাকিয়েই ত কাটিয়ে দিই—তার মানে কি হল—বল ত ?

রোণ্টি চুপ করে থাকে, কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

স্যার বললেন, এ আর ভাববার কি আছে ? যদি সত্তর বছর আমার

আয়ু হয়, তাহলে সত্যি করে আমি বাঁচব সত্তর মাইনাস পঁয়ত্রিশ—তাই নয় কি? তুমি ভেতরে যাও ত, এক কাপ কড়া করে কফি আর গোটা কয়েক কাজু পাঠিয়ে দাও ত দশরথকে দিয়ে।

ব্রোণ্টি পর্দা ফাঁক করে ভেতরে চলে গেল।

এই ফাঁকে এঁদের একটু ইতিবৃত্ত বলে নিই। অনেক পাঠকের হয়ত জানা থাকতে পারে, তবু—স্যার যাকে বলছি তিনি প্রোঃ বি, ডি, নামে বেশি পরিচিত। বাবা মা ছেলের প্রখর বুদ্ধি দেখে নাম রেখেছিলেন

বুদ্ধিধর।' পরে প্রোঃ হবার আগেই উনি নিজের নামটাকে সংক্ষিপ্ত ক'রে করলেন প্রোঃ বি,ঙড,। আর ও'র অ্যাসিস্ট্যান্ট সতের বছর কাজ করছে একসঙ্গে, তার নাম ছিল বিরিঞ্চি সান্যাল। উনি বললেন অত বড় নাম চলবে না। আমি তোমাকে ব্রোঞ্চি বলেই ডাকব। বিরিঞ্চি আপত্তি খরার বদলে বোধহয় খুশিই হয়েছিল।

প্রোফেসার বিজ্ঞানের গোঁড়া ভক্ত, ভক্ত বললেও ঠিক হয় না। বিজ্ঞানের সম্ভাবনা যে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তারই সন্ধানে সারাটা জীবন খেটে চললেন এবং এই খেয়ালে পিতার অগাধ সম্পত্তি খরচ করে চলছেন। তাঁর ভক্তসংখ্যা অনেক কিন্তু নিন্দুকের দলও ওজনে ভারী। অবশ্য তাতে স্যারের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

ব্রোঞ্চির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে এই দীর্ঘদিনের সান্নিধ্যে। যদিও স্যারের কাছে ব্রোঞ্চিকে দেখাত একটি কাষ্ঠখণ্ডের চেয়ে মোটেই পুরুষ্টু নয়। পেন্টুলাবৃত হলেও পা দুটো রোগা সারসের পায়ের মতো লাগে। মুখখানা তোবড়ানো গালে চোয়াড়ের মতো হলেও তার বুকে ভয়-ভক্তি-ভালোবাসার কমতি ছিল না।

ছয়-সাত মিনিট পরেই দশরথ একটা প্লেট আর এক কাপ কফি নিয়ে উদিত হল। কফির কাপটা টেবিলে রাখল বটে তবে ঠিক মতো রাখা হয়নি বলে সে একটা তার সরিয়ে সেটা বসাতে গেল—আর তাতেই হল বিভ্রাট। তারে হাত ঠেকাতেই 'বা-পো-লো' বলে চিৎকার ছাড়ল একটা।

সর্বনাশ করিছিলি দশরথ, তোর এত দিনেও কাণ্ডজ্ঞান হ'ল না। ২২০ ভোল্টের সারকিটের তার নিয়ে কাজ করছি। সেখানে হাত দিয়ে মরতে গেলি কেন বল ত? আর একটু হলে যে অক্কা পেতিস!

ব্রোঞ্চিও ছুটে এসেছে, আসাই স্বাভাবিক। সে কম্পমান দশরথকে ধরে ভেতরে রেখে এল।

আচ্ছা, এটা কি করছি বল ত? ব্রোঞ্চিকে সুধালেন স্যার।

ব্রোঞ্চি বলল, আমার ত 'সরী' বলা ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না—এতদিন আপনার সঙ্গে থেকেও আপনার মতলবের হদিস পাওয়া অসম্ভব তা আমি জানি।

কী আশ্চর্য! তোমার মাথায়, ইচ্ছে করে, একটা শক্ লাগিয়ে চাঙ্গা করে তুলি। বলি, আমার সেই অটোবলারের কথা বেমালুম ভুলে মেরে দিয়েছ? সেই যে যাকে নিয়ে লম্বা পাড়ি দিলুম সামপাওলোতে—অ্যা?

ও হো! ব্রোঞ্চির সত্যিই বুঝি এবার শক্ লাগে। সে বলে, হ্যাঁ, স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এ ত ঠিক সে রকম নয়, অন্য জাতের মনে হচ্ছে—

আরে সে রকম হতে যাবে কেন, এ ত একটা রোবট ঠিকই তবে একেবারে অন্য রকমের, যাকে বলতে পার শিশু-রোবট। আর রিমোট কনট্রোল নয়।

একখানা ফরেন এনভেলাপ এসেছে স্যার, বলতে ভুলে গেছিলাম, খুলে দেখব?

নিশ্চয়ই, দেখত কোথা থেকে আসছে? আমার মনে হয় হোক্কাইডো থেকে—বলেই প্রোঃ একটা চুরুট ধরালেন।

ব্রোঞ্চি খাম ছিঁড়ে চিঠি বার করে বলল, সেনেমো তাকাজি লিখছে—

বুঝেছি, তিনমাস ওদের ওখানেই ত কাজ করে এসেছি। তবে ওদের লাইন এক, আমার অন্য রকম। যাই হোক, পড়তো কি লিখেছে শুনি। ওরা কি জান, আসল জিনিস দেখাতে চায় না। ব্যাটাদের আছে সেই যে যাকে বলে প্রোফেশান্যাল জেলাসী!

ব্রোঞ্চি পড়তে লাগল। খুব সংক্ষিপ্ত কয়েক লাইনের চিঠি, তাতে একটা ডায়াগ্রাম আঁকা আছে; আর কয়েকটা উপদেশ দিতেও ভোলেনি।

স্যার বললেন, বুঝেছি, ও আমাকে একটা ভুল রাস্তা দেখাতে চায়। কি জানো, ওরা ত রোবট করছে একটা দুটো নয়—একেবারে মাস প্রোডাকশান, হাজার হাজার। সেই সব রোবট পৃথিবীর নানা দেশে ভূতের খাটুনি খাটবে। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে কাজ করবে। পঁচিশতলা বাড়ির কার্নিশে দাঁড়িয়ে ওয়্যারিং করবে, জলের মধ্যে কাজ করবে— সব দেশই লুফে নেবে সেই সব রোবট, বুঝলে। বাজার একেবারে তৈরি।

লাইনটা ত মন্দ নয় স্যার, ব্যবসা হিসেবে অনেক স্কোপ আছে—

আরে দূর! আমার কি ব্যবসা করার উদ্দেশ্য আছে নাকি? তাহলে অনেক আগেই রাশি রাশি টাকা করতে পারতুম। আমার আইডিয়া শুনে ঐ তাকাজী বলেছিল, বড় শক্ত জিনিস, তুমি পারবে না—

আমি বলেছিলাম রোবটই যখন করছি তখন তার মধ্যে মানুষের সঙ্গী হবার এবিলিটি থাকবে না কেন? ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে মিশবে না কেন? সে বলেছিল, 'দ্যাত্ মে বি পসিবল্ ইন ফিউচার—নত নাউ।'

আমারও জেদ চেপে গেল। ফিউচারকে টেনে আনব বর্তমানে। আচ্ছা ব্রোণ্ডি, তুমি একটা ১১।১২ বছরের ছেলের মতো পা ফেলে হাঁটো দেখি, আমি এর পায়ের জয়েন্টগুলো অ্যাডজাস্ট করতে চাই—

ব্রোণ্ডি চেষ্টা করতে লাগল।

হল না, হল না, ঐভাবে ছেলেরা হাঁটে না···

ব্রোণ্ডি তার লম্বা সারসের মতো ঠ্যাং বাড়িয়ে হাঁটার পোজ দিচ্ছে এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল।

দশরথ দরজা খুলতেই কথাময়বাবু সহাস্যমুখে ঢুকেই ব্রোণ্ডিকে দেখে থমকে গেছেন। বললেন, কী ব্যাপার? ব্রোণ্ডি অমন ঠ্যাং বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেন? ওকি যোগাসন করছিল, তবে পা দুমড়ে যোগাসন করা, এ আমি কোনোদিন দেখেছি বলে মনে হয় না।

প্রোঃ হো হো করে হেসে বলে উঠলেন, আরে না মশাই এ যোগাসন নয়, অন্য ব্যাপার। আপনি কিন্তু আসন গ্রহণ করুন, কথা আছে। আই মীন ভেরী ইম্পর্ট্যান্ট কথা আছে।

কথাময়বাবু বসলেন। মনটা ধুকপুক করতে লাগল। এখানে এলেই তিনি দেখেছেন তাঁর এই অবস্থা হয়। আবহাওয়াটাকে সহজ করতে প্রোফেসারই বলে উঠলেন, ব্রোণ্ডি, মেক ইওরসেলফ ইজি, আমার ওটা লাগবে না। তুমি বরং আমাদের জন্যে দুকাপ কফির ব্যবস্থা কর।

কথাময়বাবু সাহিত্যিক হলেও বুঝে নিলেন যে তাঁকে যেন কৌশলে এড়ানো হচ্ছে। তিনিও সহজে হঠবার লোক নন। বললেন, বলুন স্যার, আপনার শরীর কেমন, কাজ কেমন চলছে?

প্রোঃ বি, ডি, বললেন, আপনার ঐ ফরমালিটির প্রশ্নগুলোর এক কথায় উত্তর 'ফাইন'। এবারে আমার দু'একটা প্রশ্ন আছে। বলুন ত আপনার ছেলের বয়েস কত?

সতেরো আঠারো হল বড় ছেলেটি। আর ছোট ছেলে মাত্র বারোয় পা দিয়েছে—

'রাইট', প্রোঃ টেবিল চাপড়ে বলে উঠলেন, এই বয়সই ত আমি চাইছিলাম। ছেলেটি আবৃত্তি করতে পারে? গানের গলা আছে?

দেখুন, এখন ত পড়াশোনা করছে, অন্য বিষয়ে বিশেষ মন দিতে পারে না, তবে গত বছর ও ভাল আবৃত্তি করে একটা প্রাইজ পেয়েছিল।

ইংলিশ না বেঙ্গলি?

দুটো ভাষাতেই।

গান গায় কি?

গানের চর্চা না করলে ত শেখা যায় না, তবে তাকে অনেক দেশাত্মবোধক গান গাইতে শুনেছি—

ফাইন! আর বলতে হবে না। আপনি অনুগ্রহ করে কাল তাকে একবার আনতে পারবেন কি? সেইসঙ্গে গল্প, রূপকথা, ছড়া ও কবিতার বই যা আছে তার সব আনে যেন—আমি আমার মরিস গাড়িটা পাঠিয়ে দেব? কেমন?

।। দুই ।।

পরদিন কথাময়বাবু ঠিকই কথা রাখলেন। ছেলেকে এনেছেন। সঙ্গে একতাড়া বই। ওঁরা নিজেরাই কুসান-দেওয়া চেয়ার দুটো সরিয়ে নিয়ে বসলেন। প্রোফেসার তখন অবশ্য বাইরের ঘরে ছিলেন না। কথাময়বাবুর ছেলে সুদীপ্ত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে, এক একবার উঠে একটা ভারী পর্দার কাছে দাঁড়াচ্ছে। পর্দাটা হাওয়ায় সরে যেতে সে দেখল ভেতরে অনেক জিনিসপত্র রয়েছে, তার মধ্যে একটি ছেলে। তারই সমবয়েসী, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাবাকে জিগ্যেস করে সদুত্তর পেল না সে।

এমন সময় একটা ছোট্ট ক্যাসেট হাতে নিয়ে প্রোঃএর আবির্ভাব, পিছনে ব্রোঞ্চির হাতে একটা রেকর্ডিং মেশিন।

নমস্কার, কথাময়বাবু। বলেই প্রোফেসার ছেলেটিকে কাছে ডাকলেন।

কি নাম তোমার?

সুদীপ্ত।

বাহ্। ভাল। ইংরিজি রাইম বলতে পারবে?

সে একটা বলে গেল।

একটা দামী চকোলেট সুদীপ্তর হাতে দিয়ে প্রোফেসার বললেন, কিছু নয়, ব্যাপারটা হচ্ছে, তোমার কয়েকটা কথা বলা, আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি আমি রেকর্ডিং করব—নাও, ব্রোঞ্চি, চটপট গুছিয়ে রেডি করে ফেল—

কথাময়বাবু যেন অগাধ সলিলে। কিছুই বুঝতে পারছেন না, কেন ছেলেকে দরকার, তার আবৃত্তির রেকর্ডিংই বা কেন? এসবের মানে কি? তিনি বাক্যহীন, বড় বড় চোখ করে সবই দেখছেন! তাতেই যেন আরো বোকা বোকা লাগছে তাঁকে।

প্রোফেসারের এটা বুঝতে দেরি হল না। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি একটু ইন্ট্রোডাকশান হিসেবে বলছি। শুনুন, তুমিও শোনো সন্দীপ্ত, আমরা যে যুগে বাস করছি এটা বিজ্ঞানের যুগ, ঠিক ত? রোবটের নাম শুনেছ?

সন্দীপ্ত বলল, হ্যাঁ, পড়েছি কাগজে।

দেখাচ্ছি তোমায়, আমি তৈরি করেছি। তবে যে রোবট হাতে করে আগুন ঝরায়, ধ্বংস করে সে রকম রোবট নয়। এ হচ্ছে ঠিক তোমার মতো বয়েসী একটি ছেলে—

সন্দীপ্ত বলে উঠল, পর্দার ওদিকে ঐটিই বুঝি?

বাঃ! তোমার কৌতূহল আছে দেখছি। হ্যাঁ, ঐটিই। ওর মুখ থেকে যে কথা বার হবে সেগুলো কিন্তু বেশির ভাগ তোমার কথা, বুঝলে? তাই রেকর্ডিং করব।

বিস্ময়ের ঘোর এতক্ষণে ভাঙল কথাময়বাবুর। বললেন, এবার বুঝেছি। কিন্তু একে দিয়ে কি করাতে চান বলুন ত?

অনেক কিছু, কই সন্দীপ্ত আরো চকোলেট নাও। এগুলো সব ভাল জিনিস, সুইশমেড্। কি জানেন, এরা এমন একটি কাজ করবে যা করার লোক ইণ্ডিয়ায় পাওয়া মুশকিল। ধরুন আপনার একটি ছেলে কি মেয়েকে সঙ্গ দেওয়া, তার সঙ্গে খেলা করা, তাকে ভোলানো, তাকে শেখানো এটা কি কম কাজ? শুধু হাতুড়ি পিটে ইট গুঁড়োনোটাই একমাত্র কাজ?

পারফেক্টলি রাইট! বলে উঠলেন কথাময়বাবু, একাজ যদি করাতে পারেন তাহলে মশাই, আমি হয়ত কিনতে পারব না। তবে যাদের পয়সা আছে—

রোণ্টি জানিয়ে দিল, সব ঠিক, এবার শুরু করা যেতে পারে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি, কি জানেন এই ছেলেটির কথা বা আবৃত্তি আমি রেকর্ড করে কম্পিউটারে ফীড করব—এগুলো হবে ইনপুট—

ভেরী গুড আইডিয়া, কথাময়বাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। আর একবার।

স্যার বললেন, কিন্তু একদিনে হবে না সব। দু'চার দিন লাগবে আপনাদের।

কথাময়বাবু এবার স্বচক্ষে দেখলেন ঠিক সুদীপ্তর মতই যেন একটি ছেলে, মুখখানি মিষ্টি, কেবল হাত পাগুলো একটু আড়ষ্ঠ লাগছে।

আরও চারদিন ওঁদের আসতে হল, সুদীপ্ত এখন খুব ফ্রী। সুন্দর কথা বলছে, যেমন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু কথা বলে তেমনিভাবেই রেকর্ডিং করানো হল।

॥ তিন ॥

মাস খানেক পরের কথা বলছি।

কে, পি, হিঙ্গোরানীর বাড়ি আলিপুরে। অনেকগুলি বড় বড় ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। অগাধ পয়সার মালিক। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায় কত অ্যারিস্টোক্র্যাটিকভাবে থাকেন। বাড়িখানা যেমন বড়ো তেমনি তার সংলগ্ন লনটাও প্রকাণ্ড, চারদিকে নানারঙের ফুলের বেড। সবই অতি যত্নে রাখা হয়।

কে, পি, হিঙ্গোরানীর একটিমাত্র মেয়ে লাভলি। বাঙালী না হলেও গিন্নী ও মেয়ে সবাই বেশ ভাল বাংলা বলেন। কে, পি-র মুশকিল হয়েছে মেয়েকে নিয়ে। সাড়ে ছ' বছর বয়েস তার, তাকে পড়াবার মেয়ে-মাস্টার দুজন আছে। কিন্তু সব সময় তার সঙ্গে থাকা বা বেড়ানো এসব ত আর ভোজপুরী দ্বারোয়ানের দ্বারা হয় না। একটি মিসকে রেখেছিলেন মোটা মাইনে দিয়ে ? সে অ্যাংলো। বাংলা বলতে গিয়ে আড়ষ্ঠ হয়ে যায়। লাভলির মায়েরও মিস ডরোথিকে মোটেই পছন্দ নয়, মাঝে মাঝে নাকি স্ল্যাং বলে সে। তাছাড়া লাভলিও বিশেষ পছন্দ করে না তাকে। তাই তাকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ হিঙ্গোরানীর সাতটা বিজনেস নিয়ে যেমন দুর্ভাবনা আছে তার চেয়ে বেশি অশান্তি বোধ করেন তাঁর আদরের মেয়ের জন্যে। কী আশ্চর্য, অনেক ইন্টারভিউ নিয়েও পছন্দসই লোক কোথা ? একটাও পাওয়া যাচ্ছে না।

ওঁর অপিসের এক টাইপিস্টের সঙ্গে আবার কথাময়বাবুর কি রকম

যেন আত্মীয়তা আছে। সেইসূত্রে সে কথাময়বাবুর কাছ থেকে প্রোঃ বি, ডি,র নতুন সৃষ্টির কথা শুনে অনেক ইতস্তত করে একদিন বলে ফেলল।

স্যার, একটা কথা বলব? টাইপ-করা কাগজটা হাতে নিয়েই বলল সে।

কি বল না।

বলছিলুম, এই যুগে অনেক কিছু নতুন খবর শুনি ত, আজকাল রোবটের যুগ এসে গেছে—

তা ত জানি, তিরিশের দশক থেকেই ওদেশে রোবট তৈরি হচ্ছে। ১৯৩৯ সালে ওরা এক্জিবিট করেছিল।

আমি বলছিলুম, লাভলির জন্যে একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। এটা নাকি ঐ কাজের জন্যে উপযোগী করে তৈরি হয়েছে। আপনি প্রোঃ বি, ডি-র নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, তাঁর সেই অটো-রীডার—

সেটা জানি না, তবে প্রোফেসারের নাম জানা আছে। তিনি এই রকম করেছেন নাকি? আরে দেখলে ত হয় একবার। তুমি ওঁর ঠিকানাটা আমাকে যদি এনে দাও, তাহলেই হবে।

সত্যিই মিঃ হিঙ্গোরানী প্রোফেসারের বাড়িতে এলেন এবং কিছু দরদামের পরই কিনে ফেললেন। তবে একটা সর্ত রইল যে, এই রোবট মেয়ের ও তার মায়ের পছন্দ হওয়া চাই।

যেটা বাড়িতে আনলে, ওটা কি বাবা? অত বড় পুতুল কোথা পেলে? দেখামাত্র লাভলির অজস্র প্রশ্ন।

এটা পুতুল নয় রে, ওকে বলে রোবট, তোর সঙ্গীর জন্যে আনলুম। ও চলতে পারে, কথা বলতে পারে—কত কিছু পারে দেখলে তুই অবাক হয়ে যাবি।

মিসেস হিঙ্গোরানীও হাত দিয়ে দেখলেন, বললেন, যতই পারুক, এটা ত একটা পুতুল, তার বেশি ত নয়—একজন গভর্নেসের কাজ কি ওকে দিয়ে হবে?

হবে না, মিস্টার বাধা দিয়ে বলেন, আরে বাবা, একবার ট্রাই করে দেখতে দোষ কি।

দেখি কেমন চলে, লাভলি ওর হাত ধরে আস্তে টান দিল। ও চলতে শুরু করেছে; সেই হাঁটা দেখে লাভলির কী হি হি করে হাসি।

রোবট ঘাড় ফিরিয়ে লাভলির দিকে চেয়ে বলল, এটা আমার স্টাইল, ডোন্ট লাফ্, প্লীজ।

ওমা! কী সুন্দর কথা বলে। লাভলি যেন অবাক। বাবা আমি ওকে নিয়ে একটু লনে যাব?

যাও না। শোন, তোমায় দুটো জিনিস বলে দিই, যখন ওকে রেস্ট নিতে দেবে বা ঘুমোবে তখন এই রেড কী (Key)-টা চেপে দেবে। আর জাগাতে হলে সবুজ Key। কেমন? মনে থাকবে ত?

লাভলি ওর মুখটা দেখে খুব হাসছে, বলে ঠিক আমাদের স্কুলের শতদলের মত। মুখখানা অবশ্য তার চেয়েও ভাল। আমি ওর একটা নাম দেব, ড্যাডী।

দাও না।

ওর নাম রইল রোবু। চলো রোবু আমরা একটু লনে বেড়িয়ে আসি।

লাভলির পাশে পাশে মিলিটারী পদক্ষেপে রোবুও চলল। মিস্টার ও মিসেস দুজনেই জানলা দিয়ে ওদের দেখতে লাগলেন।

রোবু ইংরিজি বলতে পার? লাভলি জিগ্যেস করে।

ও, শিওর। ইটস এ নাইস প্লেস, এ লাভলি গার্ডেন লাইক আওয়ার লাভলি—

লাভলি ত হেসে পড়ে যায় আর কি।

তুমি বড় ফাজিলও আছ দেখছি। আচ্ছা রোবু, চলো আমরা ঐ বড় পাইন গাছটার নিচে যে বেঞ্চটা আছে ঐখানে একটু বসি। রোবু তার স্টাইলে চলতে লাগল। বেঞ্চে বসে লাভলি বললে, তুমি নাকি গল্পও জান, একটা বল না বেশ মজা হবে।

একটু চুপ করে থেকে রোবু বলল, একটা সাতরঙা মাছের গল্প বলব?

না—আ, এখন মাছের গল্প নয়, এখন বেশ পাখির গল্প হলে ভাল লাগবে।

বেশ, এক ছিল সোয়ালো পাখি, আর তার বন্ধু একটা লম্বা শর গাছ। তাতে বসলেই গাছটা নীচু হয়ে জলে মাথা ডোবায়। সোয়ালো পাখির আর এক নতুন বন্ধু জুটে গেল সে হচ্ছে সোনার রাজপুত্তুর—

ও—লাভলি বলে ওঠে, তুমি সেই সুখী রাজপুত্রের গল্পের কথা

বলছ, ওটা আমার শোনা। শুধু একটু একটু মনে আছে—সবটা ভুলে গেছি। বলো—

রোবু বলতে থাকে, তাহলে শোনো, এক সহরের ধারে সুখী রাজপুত্তুরের সোনার মূর্তি—আহা, কী সুন্দর দেখতে। সেও একা আর পাখিও একা, তাই দুজনে খুব ভাব হল। সোয়ালো সেই মূর্তির পায়ের কাছে শুয়ে থাকত, ঘুমোত—

ওগুলো জানি, তারপর যেন কি হল? বলল লাভলি।

তারপর সোয়ালো ভাবছে সে উড়ে চলে যাবে সেই তার গরমের দেশে—

কেন ?

ওরা যে ঠাণ্ডায় থাকতে পারে না। কিন্তু রাজপুত্তুর ওকে ডেকে বলল, ছোট্ট সোয়ালো, মিষ্টি সোয়ালো, আমার একটা কথা শুনবে ?—ঐ দূরে দেখতে পাচ্ছি একটি মা সেলাই করেই যাচ্ছে, তার পাশে একটা ছেলে শুয়ে আছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। আহা কী গরীব ওরা ! কোথায় ওষুধ, কোথায় পথ্য—একটা পয়সাও নেই যে—

গরীবদের অমনিই ত হয়, লাভলি বলল, জানো, আমাদের বাগানের পাঁচিলের ধারে যে কুঁড়ে ঘরগুলো না ? কী নোংরা ! সেখানেও বাচ্চারা অসুখে ভোগে আর মরে যায়—

তাই নাকি ? রোবুর যেন দুঃখু হয়।

তারপর কি হল বলবে ত—লাভলির যেন রাগ হয়ে যায়।

হ্যাঁ, তারপর সোয়ালো ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে একটা টকটকে লাল রুবী পাথর তুলে নিয়ে চলে গেল সেই সেলাই-করা মাকে দিতে—

লাভলি জিগ্যেস করে, রাজপুত্তুর তাই বলল বুঝি ? কেন দিতে বলল ? এ সব কে বলবে ? তুমি ভাল গল্প বলতে পার না।

আহা, রাজপুত্তুরের তলোয়ারের হাতলে ছিল ত রুবীটা—বুঝলে এবার— ?

এমনি সময় বাড়ির দিক থেকে ডাক এল, দিদিমণি, বাড়ি চলে এস।

যাচ্ছিরে বাবা, যাচ্ছি, এতো তাড়া কিসের ?

সন্ধে হয়ে যাবে যে, বলল বাগানের মালী।

রোবু বলল, চলো, আবার কাল বলব, কেমন ?

বাড়িতে এসে মাম্মীকে লাভলি বলল, মা আমার রোবটা কী ভাল গল্প জানে গো !

সে আবার কি ! ওর কাছে গল্প শুনছিলি বুঝি ?

হ্যাঁ গো !

ড্যাডিও শুনে খুব খুশি। দেখলে, উষা, মানুষের চেয়ে ঐ রোবুই ভাল। বুঝলে ? যন্ত্রের কোনো জ্বালা নেই। মানুষ হলেই যত ভাবনা, কে চুরি করবে, কে মিথ্যে করে লাগাবে—কে ভুল শেখাবে। এক এক লোকের এক এক সমস্যা।

মিসেস হিঙ্গোরানী বললেন, তা যা বলেছি, তবে ঐ কলের পুতুল কদিন ভাল লাগে তাই দেখ আগে।

।। চার ।।

দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। কোনো কম্‌প্লেন নেই। লাভলিকে নিয়ে রোবু এখন এক-আধবার গেট পেরিয়ে রাস্তাতেও বের হয়। আবার হাত ধরে সরিয়ে আনতে হয়। রাস্তায় কেবল গাড়ি আর গাড়ি। লনেতেই ওদের সবচেয়ে ভাল জমে।

মাঝে মাঝে ব্রোণ্ডি এসে চেক-আপ করে যায়। প্রোফেসার সেই রিপোর্ট পেয়ে বেশ মনের আনন্দেই আছেন। একদিন ব্রোণ্ডিকে বললেন, দেখ, যন্ত্রে মানুষ-মানুষ ভাব না থাকলে চলে কি! একি কলের গান পেয়েছ না টিভি পেয়েছ যে চাবি ঘোরালে চললো। নয়ত বোবা আর কালা। রোবুকে আমি করেছি ছোটদের সঙ্গী, যাকে বলে কেয়ারটেকার শুধু নয় গার্ডিয়েন আর বন্ধু এক সঙ্গে।

কথাময়বাবু এই নতুন রোবট নিয়ে এক প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেটি ছেপেও ফেলল 'শিশুজগৎ' পত্রিকা। সেই লেখা সম্বন্ধে স্যারের খুবই আগ্রহ। তাই সেইটা একদিন স্যারকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন কথাময়বাবু। এমন সময় হঠাৎ টেলিফোনের ঝনৎকার শোনা গেল।

ব্রোণ্ডি বলল, নিশ্চয়ই কোনো ইন্টারেস্টেড পার্টি ফোন করছে। সে ধরে প্রোফেসারের হাতে দিল। বলল, মহিলা কণ্ঠ, স্যার।

হ্যালো, হ্যাঁ প্রোফেসার বলছি—

আমি মিসেস হিঙ্গোরানী বলছি—শুনুন, জরুরী একটা খবর আছে। আপনি যদি কাইন্ডলি একবার আসতেন আমাদের বাড়িতে—

আমার ত এখন সময় হবে না। বলুন না কি ব্যাপার। আপনার মেয়ের খবর কি?

আপনার রোবুকে নিয়ে যান।

কাকে? মানে, আমার রোবটকে? কেন বলুন ত? কোনো ডিফেক্ট হয়েছে নাকি?

না, মানে, আমি চাই না মেয়ে আর ওর সঙ্গে খেলা কিংবা মেলামেশা করে।

আপনার মেয়ে, মানে, লাভলি কি বলে? সে কি ওকে পছন্দ করছে না?

না, তা নয়। সে ত ওকে নিয়ে পাগল।

তা হলে জোর করে ওদের বিচ্ছেদ ঘটাবেন কেন?

কি বলছেন কি? মিসেস হিঙ্গোরানীর উত্তপ্ত কণ্ঠ, আপনি কি আমার মেয়ের সর্বনাশ করতে চান নাকি?

স্যার খুব শান্তকণ্ঠেই বললেন, দেখুন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি মিস্টার হিঙ্গোরানীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

অপরদিক থেকে উত্তর এল, কোনো লাভ নেই, উনিও মেয়ের দিকে। কিন্তু আপনি বুঝছেন না কেন আমার মেয়ে বড় হচ্ছে ত, প্রায় আট বছরের হতে চলল—

তাতে কি? ছেলে মানুষ ত।

শুনুন, আপনার মাথায় ঐ কম্পিউটার ও তারের প্যাঁচ ছাড়া আর কিছু নেই দেখছি। শুনুন, আমি ৫০ পারসেন্ট টাকা চাই না। আপনি দয়া করে ওটিকে নিয়ে যান।

ঠিক আছে, আমাকে একটু ভাবতে দিন—বলেই ফোন রেখে দিলেন প্রোফেসার বি ডি।

নতুন কি বিভ্রাট হল বলত ব্রোঞ্চ? আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। কথাময়বাবু বললেন, একটা হতে পারে, ওঁরা হয়ত খুব ভাল কোনো লোক বা মিস পেয়ে গেছেন—তার উপর মিসেসের খুব বিশ্বাস, তাই যান্ত্রিক ব্যাপার থেকে মুক্তি খুঁজছেন।

মিনিট পনেরো কেটে গেছে, কথাময়বাবু উঠবো উঠবো করছেন এমন সময় খশ্-শ-শ করে একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল বাইরে। একটু পরেই মিঃ হিঙ্গোরানী স্বয়ং এসে হাজির সঙ্গে প্যাককরা রোবু। তিনি বললেন, একে নিয়ে আসা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিল না। মেয়ে অবশ্য কান্নাকাটি করছে, কিন্তু একে রাখলে তার মার সঙ্গে আমার হয়ত ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে—

বলেন কি। স্যার বলে ওঠেন, এতটা সিরীয়াস হয়ে পড়ল কি করে? একটু বলবেন কি?

মিঃ হিঙ্গোরানী বললেন, মিসেসের বক্তব্য শুধু সংক্ষেপে বলছি। আমার সময় বেশি নেই। তিনি বলেন, নাম্বার ওয়ান, মেয়ের সঙ্গে

মেয়ে-আয়া বা মেয়ে-সঙ্গী থাকাই ভাল, আপনি ওকে ছেলের রূপ দিয়েই মুশকিল করে বসেছেন, মশাই।

নাম্বার টু, হাজার হোক একটা যন্ত্র ত, তার সঙ্গে যদি মেয়ে বেশিদিন মেলামেশা করে তাহলে পরে মানুষকে ও নিতে পারবে না—এই হল গিন্নীর অভিযোগ। প্রোফেসার গাল থেকে হাত নামিয়ে বললেন, আই সী!

মিঃ হিঙ্গোয়ানী আবার বলতে থাকেন, নাম্বার থ্রি এল, একদিন রোবুর কথায় লাভ্‌লি খুব হাসছিল, বোধহয় হাসির গল্পটল্প হচ্ছিল। আমার স্ত্রী ইচ্ছে করেই কাছে বসে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন।

আচ্ছা, তারপর?

হঠাৎ তাঁর কানে এল, লাভলি কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে, সে বলছে, তোমার সংগে কথা বলব না রোবু, তুমি বড় দুষ্টু হয়েছ। সংগে সংগে রোবু বলে উঠল রাগ করো না ডারলিং!

আমার স্ত্রী বই ফেলে সেই মুহূর্তে লাভলিকে ডেকে নিয়ে যান ঘরে এবং বলেন, তুমি ওর সংগে আর মিশবে না।

কেন মাম্‌মী?

ওকে প্যাক করে তোমার ড্যাডি দিয়ে আসবেন ওর বাড়িতে।

মেয়ে বলে, ওর বাড়ি? কেন এটা ওর বাড়ি নয়?

না। যাও, এখন তোমার হোমটাস্ক করগে, একটু পরেই টিচার আসবেন, জান না?

লাভলি চলে যেতে যেতে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগল।

লিভিং রুমে তখন রোবু একা পায়চারি করছে আর রাইম বলছে; লাভলি জানলার ফাঁক দিয়ে দেখছিল।

'এ ওয়াইজ ওল্ড আউল স্যাট অন এ ওক,
(ক্লিক্ ক্লিক্) দ্য মোর হি হার্ড দ্য লেস হি স্পোক।'

মিসেস সেই ঘর দিয়ে যেতে যেতে আরো শুনতে পেলেন, সে বলছে,

'ডু ইউ লাভ মি অর ডু ইউ নট্
ওয়ানস্ ইউ টোল্ড মি
বাট আই ফরগট।'

তার পরই মিসেসের জেদ চেপে গেল ওকে বাড়িতে রাখা চলবে না।

এখন বুঝলেন ব্যাপারটা?

হো-হো-হো—প্রোফেসারের হাসি আর থামে না। কিঞ্চিৎ শান্ত

হয়ে বললেন, আরে মশাই রোবুর ভিতর হয়ত একটা ইচ্ছা করার শক্তি তৈরি হয়েছে, কিংবা সবটাই কোইনসিডেন্স। তাও হতে পারে। ব্রোঞ্চি, ওকে নিয়ে যাও ভিতরের চেম্বারে রেখে এসো। ঐ রাইমগুলো যে গুলো রোবুর মুখে শুনেছেন, ওগুলো কি জানেন, কথাময়বাবুর ছেলের অবদান। ছড়া গল্প সবই তার গলার রেকর্ড। আর যদি বলেন রোবুর ব্রেনের মধ্যে একটা অনুভূতির স্পর্শ লেগেছে এবং তা যদি সত্যি হয় তাহলে ত মশাই, আমি বলব, ওটা আমারই একটা গ্রেটেস্ট অ্যাচিভমেণ্ট।

ব্রোঞ্চি ধরতেই রোবু নেমে এল গট গট করে। সবার পাশ কাটিয়ে ভেতরে চলে গেল। পিছনে গেল ব্রোঞ্চি।

ওয়েল মিঃ হিংগোরানী, আমাদের কনট্র্যাক্ট মত আপনি আমার কাছে টাকা পাবেন কিন্তু সবটা নয়, কেননা, লাভলি ওকে পছন্দ করেছে। তাই নয়?

না, মিঃ বি, ডি, আমি টাকা চাইছি না, আই ক্যান ফোর গো ইট। আমাদের কনট্র্যাক্ট রইল, টাকা রইল এবং শিশু রোবট বোবুও রইল— বলেই মিঃ হিংগোরানী উঠে দাঁড়ালেন এবং দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

আর একবার মোরামের রাস্তায় টায়ার চলার আওয়াজ শোনা গেল খশ-শ-শ।

সেদিন লাঞ্চ খেয়ে অন্যান্য কাজ সারতে বেশ দেরি হয়ে গেল। বিকালে স্যার খানিকটা পায়ে হেঁটে বেড়ান। সেদিন একটা পার্কে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন আর দেখতে লাগলেন বিকালের পড়ন্ত রোদ্দুরে ছেলেমেয়েদের খেলা। একটা আনন্দের অনুভূতি যেন পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে বাতাসে। সন্ধ্যার পর বেশ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি এলেন। মনের মধ্যে নানা চিন্তা ভিড় করে আসছিল। তার মধ্যে বড় চিন্তা হল, ছোটদের আমরা চিনি না কেন? আর চিনিনা বলেই তারা স্বাভাবিক হয়ে গড়ে ওঠে না … পৃথিবীটা স্বর্গ হয় না।

হঠাৎ চিন্তাগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছোট শিশি থেকে একটা ট্যাবলেট মুখে পুরে একটু জল খেলেন, আর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

স্যারকে ঘুমন্ত দেখে দশরথ তিনবার এসে ফিরে গেল, ডাকতে পারল না ডিনার খাবার জন্যে। স্যার মাঝে মাঝে এমনি না খেয়েও থাকেন। কিন্তু তাঁর ঘুম ভাঙাবার অধিকার নেই কারো।

রোণ্ডির ডাকে যখন ঘুম ভাঙল তখন সাড়ে আটটা। ব্রেকফাস্ট খেতে বসেও শান্তি নেই। পেট চুঁই চুঁই করছে অথচ দেখেন ডিমগুলো না হাফ বয়েল্ড, না ফুল বয়েল্ড। দশরথটা এখনও শিখল না কোনটা কিভাবে করতে হয়।

হঠাৎ রোণ্ডি এসে শুকনো মুখে দাঁড়াল।

স্যার বললেন, ডিস্যাস্ট্রাস্ !

রোণ্ডি বলল, ইয়েস স্যার। সত্যিই তাই—

হোয়াট ডু ইউ মীন ?

আমাদের রোবটকে পাচ্ছি না।

অ্যাঁ ! কি যা তা বকছ, কাকে পাচ্ছ না ?

—রোবটকে স্যার।

—খুঁজে দেখ ভাল করে।

দেখেছি, সব তন্ন তন্ন করে। কিন্তু—

কিন্তু কি ?

আমাদের ল্যাবরেটরীর ব্যাক ডোরের ছিটকিনিটা খোলা ছিল।

ওটা নিশ্চয়ই দশরথের কাজ। ওকে ওধারে যেতে দাও কেন ?

না, বলছে ও যায়নি।

তাহলে কি হতে পারে ? বজ্র হুংকার ছাড়লেন স্যার, ওকি কিডন্যাপড্ হল ? যাও, এখনি খবর দাও পুলিশে। দরকার হলে ডায়েরি একটা করবে।

॥ পাঁচ ॥

না। রোবুকে কেউ কিডন্যাপ করেনি, সে নিজেই গভীর রাতে ল্যাবরেটরীর পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে।

যত্নে থাকা যার অভ্যাস সে কি আমাদের দেশের পোড়ো জায়গা, রাবিশ আর আগাছার ঝোপঝাড় ভেঙ্গে হাঁটতে পারে ? প্রতিক্ষণেই সে ভাবছে স্থানটা বড় দুর্গম। সন্দেহ হচ্ছে গন্তব্যস্থলে পেঁছুতে পারবে ত ? গন্তব্যস্থল যে কোথা তাও কি ঠিক জানে সে ?

তবু রোবু চলেছে। কাঁটা-ঝোপকে তার ভয় নেই, বেদনাবোধ নেই তার স্নায়ুতন্তুতে। তবে পোষাকটা ত স্টীলের তৈরি নয়, প্যান্টটা

মোটা টেরিলিন হওয়া সত্ত্বেও তিন চার জায়গায় খোঁচায় ছিঁড়েছে। তবে জুতোটা ছিল ধাতব, তাই সব কিছু দলে মাড়িয়ে চলার উপযোগী যুদ্ধের ট্যাংকের মতো চলছিল সে।

যাক বাঁচা গেল, একটা বড় রাস্তা পাওয়া গেছে। সেখানে ঢালু বেয়ে উঠে সে দাঁড়াল সোজা হয়ে, যেন নিরাপদ হল সে।

কিন্তু কোথায় যাবে রোবু?

তখনও শেষ রাতের অন্ধকার কাটে নি। গাছে গাছে পাখিরা জেগেছে কেউ বা কলকাকলি শুরু করেছে। রাস্তা প্রায় জনহীন। ফুটপাতে কুকুর ঘুমুচ্ছে।

রোবুর মনে পড়ে লাভলিদের বাড়িতে ঠিক এই সময় চারদিক থেকে নানা ফুলের গন্ধ অনুভব করত সে। আর একটু বেলা হলে তবে লাভলি দোতলা থেকে নেমে তার কাছে আসত। তার জামার ওপর হাত বুলিয়ে দিত, বোতামগুলো ঠিক আছে কিনা দেখত। একটু ঘষে পালিশ করে দিত।

লাভলিদের বাড়িটা কোনদিকে কে জানে? পথটা তার চেনা হয়নি। দুবারই মোটরে চেপে সে গেছে এসেছে। একমাত্র সে জানে লাভলির বাবার নামটা—কে, পি, হিঙ্গোরানী, ঠিকানাও তার অজানা।

ধীরে ধীরে পা ফেলে চলছে সে। একটু পরে একটা গাড়ি হুশ করে চলে গেল পাশ দিয়ে। দূরে এক একটা জায়গায় সোনালি রোদের ফালি পড়েছে রাস্তার ওপর। হাতের ঘড়িটায় সে সময় দেখল সাড়ে সাতটা। এই সময়টা অন্যদিন সে লাভলির সঙ্গে লনে বেড়াচ্ছে আর গল্প বলছে।

হঠাৎ দুজন লোক সামনে এসে যেন ওকে পথ আটকাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। ও ঠিক সেই সময় মাথার টুপিটা খুলতে গেছিল।

কে তুমি? একজন বলল।

রোবু বলে উঠল, পথ ছাড়ো।

না, পথ ছাড়ব না। তোমায় বলতে হবে তুমি কে? আর কোথা যাচ্ছ?

বলতে পারি, রোবু বলে ওঠে, যদি আমাকে একটা টেলিফোন করতে দাও।

দেব, আমাদের বাড়িতে যেতে হবে।

চল, কত দূর?

বেশিদূর নয়, তোমার নামটা ত—

আমার নাম রোবুলাল।

তুমি ত মানুষ নও। যন্ত্রের মানুষ—

হ্যাঁ, তাতে কি হল? আমি যন্ত্রের মানুষ।

লোক দুজন ফিস্‌ফিস করে কি যেন বলাবলি করতে লাগল। এক-জনের গলাটা বিশ্রী, খসখসে কর্কশ, ভাবভঙ্গিও অনেকটা গুণ্ডাগোছের। সে খুব চাপা গলায় তার বন্ধুকে বলছিল, 'ওর পার্টসগুলো খুলে বেচে দিলে, বুঝলি ৫০।৬০ হাজার টাকা হেসে খেলে পাওয়া যাবে। একে ছাড়া উচিত নয়……

রোবু তার কানে শোনার রেঞ্জটা বাড়িয়ে নিয়ে সেই ফিস্‌ফিস কথাও শুনতে পেল।

অন্য লোকটি বলল, ন্যারে না, আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাব, এমন একটা জিনিস ছেলেমেয়েদের দেখাব না? এই সুন্দর জিনিসটা তুই ভাংগতে বলছিস!

আরে টাকাটা কি কিছু নয় নাকি? ওকে পেয়ে বাড়ির ল্যেক আর বাচ্চারা যদি না ছাড়ে?

সে পরে দেখা যাবে—

কখনও নয়। আমাকে হাত লাগাতে হবে দেখছি—বলে সে আস্তিন গুটোতে লাগল।

বটে, আমার কথায় বিশ্বাস হল না। এই বুঝি বন্ধুত্ব? তুই হাত দে আমার সংগে হয়ে যাবে একচোট!

রোবু বলে উঠল, 'এ ফ্রেণ্ড ইন ডীড ইজ এ ফ্রেণ্ড ইনডিড!'

ওর কথা শুনে দুজন লোকই একটু হেসে উঠল। একজন বলল, কী সুন্দর কথা বলে শুনলি!

রোবু এবার কড়া সুরে বলল, আমার ক্ষতি করতে যদি চেষ্টা কর, তার ফল পাবে। ফোর ফরটি ভোল্ট শক্ লাগিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি আমি।

বলে কি রে?

গুণ্ডার মত লোকটা ভয় খেয়ে গেছে বোঝা গেল। সে দেখল বেশ বেলা হয়ে গেছে, লোকজন গাড়িঘোড়া চলছে, প্রায় সব দোকানপত্র খুলে গেছে। এখন কোনো ঝামেলা করলে লোকের হাতে সে মার খাবে। কাজটা গুবলেট হয়ে যাবে।

সে কর্কশভাবে বলল, তুমি ফোন করতে পারবে ?

কেন পারব না। নাম্বারটা শুধু দেখে দেবে তোমরা।

অন্য লোকটি বলল, তুমি নাম্বার জান না ?

না।

নাম জান ত ?

নিশ্চয়ই।

এরা দুজনে চাপা গলায় হাসতে লাগল।

একটা ক্রসিংএর কাছে এসে সেই গুন্ডাগোছের লোকটা বলল, তুই যদি একে বাড়ি নিয়ে যেতে চাস নিয়ে যা। আমি যাই, একটু কাজ আছে। বুঝলি ?

বলেই সে একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। কিন্তু একটু পরেই গলি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, এই হেমা, একটা কথা আছে শুনে যা। হেমা কাছে যেতে বলল, ফোনের নাম্বার যখন দিবি খবরদার পুলিশের নাম্বার দিসনি। থানাও নয়—কেমন ?

আচ্ছা, সে তোকে ভাবতে হবে না।

রোবুর কাছে এসে হেমাঙ্গর একবার ইচ্ছা হল একটা ট্যাক্সি নেয়, কেননা রাস্তায় ক্রমেই লোক জমা হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা স্কুল ভুলে তাদের পেছু নিয়েছে। দোকানের খদ্দের ভুলে দোকানী তাকিয়ে আছে ঐ বিচিত্র জীবটিকে দেখার জন্যে। সে অবস্থায় রাস্তা চলাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।

তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে ছিল, এদের কেউ যেতে চাইলে না। ভাগ্য ভাল, আর একখানা আসছিল সেটা ধরে ফেলল হেমাঙ্গ। তারপর একেবারে বেলভিডিয়ারে—একটা কোয়ার্টারে এসে হাজির। সেইটাই হেমাঙ্গর বাড়ি।

রোবুকে দেখে বাড়ির লোক প্রথমটা চমকে উঠল, তারপর তার গা হাত পোশাক সব খুঁটিয়ে দেখল। হেমাঙ্গর মেয়ে কুমকুম বলে উঠল, বাবা, কী সুন্দর ছেলে-পুতুল গো ! এত বড় পুতুল আমি দেখিনি কখনো—

এটিকে পেলে কোথা বলত ? কুমকুমের মা বলল, আমাদের দেশে এ জিনিস হয় বলে ত জানি না।

॥ ছয় ॥

হেমাঙ্গ একটু মজা করার জন্যে বলল, এ কথাটা ওকেই জিগ্যেস কর

ন।

কুমকুম বলল, ডল পুতুল, ও ডল পুতুল—

আমার একটা নাম আছে, বলে উঠল রোবু। আমাকে 'রোবু' বলে ডাকবে।

ওমা! কি কথা বলে! সবাই হেসে ওঠে।

কুমকুম বলল, বেশ নাম ত তোমার, রোবু। তা রোবু, আমার বাবাকে পেলে কি করে, বলবে?

বাপ্পা বলল, না না, বাবা তোমায় পেল কি করে, বলত।

রোবু ঘাড় নেড়ে সুর করে বলে—

সিম্পল সাইমন মেট এ পাইম্যান
গোইং টু দ্য ফেয়ার!

হো হো, হি হি হাসিতে সবাই গড়াগড়ি যায় আর কি। তারপরে সকলে একটু দম নিয়ে বলল, ও রোবু তুমি ত খুব ইংরিজি রাইম শিখেছ—

বাংলাও জানি। বলল রোবু, একটা বলব?

একটা বল না, লক্ষ্মীটি।

রোবু শুরু করে—

'আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি
রেন কাম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম।'

এবার একটা সুকুমার রায়ের বলছি—

'আরে আরে ওকি কর প্যালারাম বিশ্বাস
ফোঁস ফোঁস অত জোরে ফেলনাকো নিঃশ্বাস।'

হেমাঙ্গ ঘরে ঢুকে দেখে যেন চাঁদের হাট বসে গেছে, আর সেই হাটে খই ফুটছে না, ছড়া ফুটছে। তার সঙ্গে হাসির অর্কেস্ট্রা বাজছে যেন। হেমাঙ্গর খুব ভাল লাগল, কিন্তু ভয়ও হল। সে গম্ভীর হয়ে বলল,

শোনো সকলে, তোমাদের পরীক্ষার পড়া আছে, তারপর সকাল সকাল শুতে হবে। তা না হলে সকালে উঠতে দেরি করে ফেলবে। রোবুকে এবার ছেড়ে দাও। আমি ওকে নিয়ে যাই। চলো রোবু—

না বাপী, না, কুমকুমের জোরালো আপত্তি, আর একটু থাক—

রোবু বলে ওঠে—

আরলি টু বেড/আরলি টু রাইজ
মেকস্ এ ম্যান /হেলদি ওয়েলদি এণ্ড ওয়াইজ।

দেখলি ত, হেমাঙ্গ বলে ওঠে. রোবুও জানে। ওকে আমি একটু রেস্ট দিতে চাই। আমার ঘরে ওকে খুব সাবধানে রাখতে হবে। আর শোনো, তোমরা যেন এর কথা কোনো রকমে কাউকে বলবে না। বাইরের লোক কেউ যেন জানতে না পারে।

রোবু বলল, কই! আমি যা চেয়েছিলুম তা দিলে না ত!

কি বলত! হেমাঙ্গ অবাক হয়ে গেল।

ঐ যে ফোন।

ওহো, একেবারে ভুলে গেছি, দাঁড়াও—গাইডটা খুলি। বল ত নামটা কি?

রোবু বলল, কে, পি, হিঙ্গোরানী।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে পাওয়া গেল।

হেমা বলল, ওরে বাবা, এর নামে যে অনেকগুলো লাইন। তিনটে নাম্বার অপিসের, আবার একটা রেসিডেন্স।

বাড়িরটা আমি চাই।

লাইন পাওয়া গেল। কিন্তু রিং বেজে চলেছে, কেউ ধরছে না। পুরো এক মিনিট পরে ধরল একজন।

হেলো, হেলো! রোবু ফোনটা ধরল।

এটা কি হিঙ্গোরানীর বাড়ি?

হ্যাঁ, কাকে চাই?

লাভলি আছে?

আছে। সে এখন লেখায় ব্যস্ত। কে কথা বলছো?

আমি রোবু, আপনি কে?

আমি? আমি তার নতুন আন্টি। কিছু—

না, কিছু বলতে হবে না, ফোন ছেড়ে দিল রোবু।

হেমা বলল, কাকে ফোন করছিলে ? তোমার বন্ধু নাকি ?

হ্যাঁ, এ গুড ফ্রেন্ড। তোমার বন্ধুর মত নয়। তোমার বন্ধু যা বলছিল, সব শুনেছি আমি। পুলিশ নিয়ে কথা হচ্ছিল না ? যদি পুলিশে ফোন করি তাতে ওর ভয়ের কি আছে ?

থাক, সে কথা পরে হবে। তুমি এখন রেস্ট নাও। এই ঘরে তোমায় আমি লক-আপ করে রাখব, কেমন ?

তাহলে তোমায় একটা কথা বলতে চাই, বলল রোবু। আমার যখন রেস্ট দরকার, তখন আমার কোমরে যে লাল সুইচটা আছে, এটা টিপে দেবে। ওটা টিপলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব। আর জাগাতে হলে সবুজ সুইচটা টিপলেই হবে। মনে থাকবে ?

হেমাঙ্গ একটু হেসে বলল, থ্যাংক ইয়ু। এখন আমি তোমার লাল সুইচটা টিপে দিচ্ছি—গুড্ নাইট। সে লাল সুইচ টিপে দিল।

গুড্ নাই-ট—বলতে গিয়ে রোবুর কথা জড়িয়ে গেল। মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ দুটি বুজে এল আর সমস্ত দেহটা নিশ্চল হয়ে পড়ল। যেন সে একটা সত্যিকারের ডল পুতুল।

হেমাঙ্গ পরীক্ষা করবার জন্যে তিনবার তাকে ডাকল, রোবু, রোবু, আর ইয়ু স্লিপিং ? কোনো সাড়া নেই।

হেমা নিজের প্রশ্নে নিজেই হেসে উঠল, ঘুমুলে কি কেউ সাড়া দেয় নাকি ? আমি একটি বোকা।

।। সাত ।।

একদিন দু'দিন করে, ছ'সাত দিন কেটে গেছে। রোবু এখানেও অনেক বন্ধু পেয়েছে। বাচ্চারা ওর কাছে গল্প শোনে, ছড়া শোনে। কখনও বা ওরা রোবুকে শোনায়। ওরা ভীষণ মজা পায়। পাশের ফ্ল্যাটের ছেলেমেয়েরা দু'একজন আসে। তাদের মুখে মুখে ফিসফিসিয়ে কথা অন্য ছেলেমেয়েদের কানে যায়। এমনি করে খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

হেমাঙ্গর বন্ধু সেই বিরজু সে কিন্তু ভোলেনি। সে প্রস্তুত হচ্ছিল। সে ভাবছে, হেমা ত কথা রাখল না, আড্ডাতেও আর আসে না। যা করবার সে নিজেই করবে। যেমন করে হোক পুতুলটা হাতিয়ে আনতে হবে। সে একটা মতলব আঁটল।

মিশ্র নামে এক লক্ষপতির দালালের সঙ্গে সে কথা বলল। দালাল মালিককে বলল। মালিক চোরাই ব্যবসাও করে। সে মোটা টাকা দিতে রাজী হল, কিন্তু মালটা তার হাতে পাওয়া চাই।

ঠিক আছে। বিরজু ভাবল, এ ত সামান্য কাজ, তার বদলে অনেকগুলো টাকা হাতে আসবে।

একদিন সুযোগও এসে গেল। একটা রবিবার ড্যাডির অনুমতি নিয়ে ছেলেমেয়েরা রোবুকে বাইরের লনে বার করেছে। লনে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। আশেপাশে এক ডজনের বেশি বাচ্চা তার সংগে সংগে চলছে। বিরজু তার সাকরেদকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে ঢুকল, যেন কিছুই জানে না।

এক সময় রাস্তার কাছাকাছি গেছে আর একটা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল রোবুর ওপর। তাকে ধরেই পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে ছুট দিল। ছেলেমেয়েরা চিৎকার করে আকাশ ফাটাল কিন্তু ততক্ষণে ও গেট খুলে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে।

রোবু এই হঠাৎ আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তা সত্ত্বেও সে লোকটার মাথায় বার বার শক্ লাগাতে লাগল। লোকটা ঢলে পড়ল। কিন্তু নিমেষের মধ্যে বিরজু ছুটে এসে রোবুকে তুলে পাশে দাঁড় করানো একটা গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। গাড়িটা আর কারো নয়, সেই মিশ্রের যিনি ঐ বস্তুটির জন্যে অনেক টাকা আগাম খরচ করেছেন।

গাড়িতে একটা অস্বচ্ছ পলিথিনের চাদর রাখা ছিল, তাতে রোবুকে জড়িয়ে নিতে নিতে গাড়িটা দ্রুতগতিতে ছুটল।

বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অতি সন্তর্পণে তাকে নামানো হল এবং নিরাপদ ঘরের মধ্যে মোড়ক খোলা হল। সকলে দেখল একটা সুন্দর পুতুল। রোবু ত তখন নিদ্রিত, একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। কেমন করে কেউ জানে না, রোবুর কোমরের লাল সুইচে কারো হাত লেগেছিল এবং তার কাজ সে করেছে রোবুকে নিদ্রামগ্ন করে দিয়েছে। কুমকুমদের লনের ঘটনা, বিরজুর হস্তক্ষেপ—এ ছাড়া আর কিছুই জানে না সে।

মিঃ মিশ্র শুনেছিলেন তাঁর দালালের কাছে যে ঐ ছেলে-রোবট হাঁটতে পারে, কথা বলতে পারে—কিন্তু কই সে এমন বোবা হয়ে গেল কেন? তবে কি এটা নকল? তাকে ঠকানো হয়েছে? নাকি যান্ত্রিক

কারণে আউট অব অর্ডার? হতে পারে ওরা কেউ জানে না কেমন করে চালাতে হয়।

মিঃ মিশ্রের সেক্রেটারী বলল, স্যার শুনেছেন, কাগজে একটা বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছে, খুব সম্ভব এটির সম্বন্ধেই।

কি বল তো?

তাতে আছে, 'একটি শিশু রোবট মিসিং। এটি একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। কারো অধিকার নেই সেটিকে আটকে রাখে। পুলিশ-অনুসন্ধান চলছে।'

তা হলে কি করা যায়?

আমরা ত তাই ভাবছি। একটা পুতুল নিয়ে অত ঝামেলায় পড়বেন?

মিঃ মিশ্র বললেন, ঠিক আছে একটা উপায় আছে। সেইভাবে আমি এর মোকাবিলা করব।

কি করবেন?

তোমাদের আমি এখন তা বলতে চাই না। জানিনা তোমরা সে বিশ্বাস রাখবে কিনা। এর সম্বন্ধে নানা কথা বলে তোমরাই হয়ত আমাকে ভুল বুঝিয়েছিলে। বলেই মিশ্র ভেতরে চলে গেলেন।

মিঃ মিশ্রকে পরদিনই এলাহাবাদ যেতে হবে। একটা সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে। তিনি ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করে রেখেছেন। জিনিসপত্রের সংগে পলিথিন জড়ানো রোবটকেও তুলে নিলেন একটা বাক্সে।

তারপর ট্রেনে দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তাঁর কৌতূহল হওয়ায় ঐ পুতুলটি নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। মনে মনে হতাশ হয়ে ভাবছিলেন, রোবট না হাতি! আমায় একটা ডল গছিয়েছে ওরা ঐ ঘুঘু স্কাউন্ডেল:

হাতের নাড়াচাড়ায় হঠাৎ সবুজ সুইচে চাপ পড়তেই রোবু চোখ খুলল। মুখ দিয়ে কথা বেরুল 'আমি কোথা? কুমকুম—!

মিঃ মিশ্রের মুখে হাসি। এই ত ঠিক আছে, তাহলে এই সুইচটাই আসল—দেখি ত লালটা টিপে—ওমা, রোবু ঘুমিয়ে পড়ল।

ওদিকে প্রোফেসার বি, ডি-র মন অত্যন্ত খারাপ। কাগজে 'হারানো' বিজ্ঞাপন দেওয়ার পর, কোনো সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

রোশি রোজ চিঠিপত্রের তাড়া নিয়ে আসে কিন্তু কই তার মধ্যে রোবুর কোনো খবরের ইঙ্গিত থাকে না। বিজ্ঞাপনে কি ফল হল তবে?

বার বার হিঙ্গোরানীর বাড়িতে ফোন করেও তাঁদের পাচ্ছেন না। তাঁরা নাকি কলকাতার বাইরে চলে গেছেন।

॥ আট ॥

রোবু যখন মিঃ হিঙ্গোরানীর বাড়িতে ছিল তখন লাভলির আনন্দ-উৎসাহের সীমা ছিল না। যেমন খেলা হত, পড়াতেও তার মন ছিল। কিন্তু যেদিন রোবুকে ওঁরা সরিয়ে দিলেন, সেদিন থেকেই লাভলি যেন মুষড়ে পড়ল। ফলে বাড়িতে অশান্তির মাত্রা বাড়ল।

লাভলি কিছুতেই কারো কথা শুনছে না। পড়াশোনা ত সিকেয় উঠেছে। তার দুঃখ অভিমান তাকে না বলে রোবুকে কেন বিদায় করা হল। কি দোষ করেছিল সে? চুপিসাড়ে তাকে কেন সরানো হল?

মা অনেক করে বোঝালেন, কিন্তু কোনো ফল হয় না। সে তার জেদ ছাড়ে না। কিছুই বিশ্বাস করে না সে। সব সময় রোবুর কথা যেন তার মুখে লেগে আছে।

রাগের মাথায় মা দু'এক ঘা চড়-চাপড় কষিয়ে দেন। তাতে অশান্তি আরো বাড়ে ছাড়া কমে না। মিঃ হিঙ্গোরানী বলেন, তুমি ওর গায়ে হাত তুলবে না। আমি ওকে বলে বোঝাব।

মিসেস বলেন, তোমার আদর পেয়ে পেয়েই ওর সাহস বেড়ে গেছে।

কখ্‌খনো না। তোমার শাসনে ওর মেজাজ বিগড়ে গেছে। রোবুকে বিদায় করাটা উচিত হয় নি।

সে থাকলে আরো অনেক ক্ষতি যে হত সে তুমি বুঝবে না।

মিঃ আর তর্ক না তুলে বললেন, এক কাজ করলে হয়।

কি?

চলো না আমরা সকলে কোথাও বেড়াতে যাই। অন্য পরিবেশে লাভলি সম্ভব আনন্দ পাবে আর তার রোবুকে ভুলে যাবে।

মন্দ নয়, মেয়েকে বলে দেখ।

মেয়েকে রাজী করানো হল। ক'দিনের মধ্যে ওঁরা বেরিয়ে পড়লেন বোম্বাইয়ের উদ্দেশে।

যেতে যেতে পথে লাভলিকে তাঁর ড্যাডি বলছেন, বোম্বেতে কেমন হবে দেখবি। একটা বড় হোটেলে আমরা থাকব, কত ভাল ভাল বন্ধু হবে তোমার।

বন্ধু আমার চাই না—আচ্ছা ড্যাডি, রোবু এখানে এলে আরো কত মজা হত, তাই না?

তা হত বটে, তবে খেলার সঙ্গী এখানে অনেক পাবে। ওখানে হোটেলে আছে সুইমিং পুল, তাতে আমরা সবাই সাঁতার কাটব।

বোম্বাইয়ে ওঁদের অপিস রয়েছে, তাদের লোক আগে থেকে সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

হোটেলের মধ্যে হল ঘরটা কী সুন্দর, গদীর মত মোটা কার্পেট দিয়ে মেঝে ঢাকা, চারদিকে আলো। প্রায় সব সময়ই মিউজিক বাজছে। মিসেস ত সবার সঙ্গে মিশছেন। লাভলির সঙ্গে অনেক সমবয়েসী মেয়ের আলাপ করিয়ে দিলেন।

লাভলির কিন্তু সেই মনমরা ভাব কিছুতেই যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বলে উঠছে, আচ্ছা, ড্যাডি এখানে রোবু এলে বেশ মজা হত, ঠিক না?

ড্যাডি বললেন, চল, আজ আমরা মেরিন ড্রাইভে বেড়াতে যাব। সেখানে সমুদ্র দেখতে পাবে। আর একদিন জুহুবীচে, ওহ, কী মজার জায়গা সেটা।

এখানে একটা অ্যাকোয়ারিয়াম আছে না? বলল লাভলি।

হ্যাঁ, সেখানে যাব তোমায় নিয়ে—কত রকম যে মাছ রয়েছে—তারপর আমরা যাব কমলা নেহরু গার্ডেনে—সেটা তোমার যা ভাল লাগবে ফ্যানটাস্টিক! সেখান থেকে সমুদ্র দেখবে আরও সুন্দর।

ওখানে ওর এক বন্ধু হল, লুসি, বব্ করে চুলছাঁটা, প্রায় যা বলে সব ইংরিজিতে।

মামমি বললেন, লুসি কেমন মেয়ে দেখত, কেমন স্কিপিং করে, খেলে আবার গান গাইতে পারে।

লাভলি বলে উঠল, আচ্ছা মামমি, এখানে রোবু থাকলে বেশ মজা হত, লুসি অবাক হয়ে যেত—

থামো, মিসেস ওর কথা থামিয়ে বললেন, নো মোর অব রোবু। এখানে এত জিনিস রয়েছে কেমন নতুন জায়গায় আমরা বেড়িয়ে দেখছি। তোমার কেমন লাগছে বল। ভাল লাগছে না?

লাভলি টেনে টেনে বলল, না-আ-আ—

মিঃ হিঙ্গোরানী এসব শুনে বললেন, তাহলে আর এখানে থেকে লাভ কি, চলো, দিল্লী যাওয়া যাক, কি বলিস লাভু ?

চলো, তাই যাওয়া যাক, বললে লাভলি।

॥ নয় ॥

চললেন ওঁরা দিল্লীতে। ওখানে ওঁদের কোম্পানির অপিস আছে। টেলি পেয়ে ভাল হোটেল বুক করে রাখল ওঁরা। এ হোটেলও খুব ভাল, তবে বেড়াবার জায়গা অত বেশি নেই। ওখানে এক ভৃত্যের নাম শিউচরণ, তার উপর ভার পড়ল লাভলিকে সংগ দেওয়ার। দিদিমণির যখন যেটি দরকার সে তম্মুহূর্তে তা করে দিত, একবার জানালেই হল। দিদিমণিকে খুশি করতে শিউচরণ তটস্থ।

কথায় কথায় লাভলি তাকে বলেছিল রোবুর কথা। শিউচরণ সবটা ভাল বোঝেনি, তাই সে একদিন ওকে নিয়ে একটা বড় দোকানে গিয়ে এক গাদা পুতুল কিনে আনল। কোনটা দম দিতে হয়, কোনটা ব্যাটারীতে চলে।

মিসেস বললেন, সাড়ে ছ'শ টাকা জলে দিলি শিউচরণ। ঐ দেখ, সেগুলো পড়ে আছে—যেমনটি এনেছিলি সেইভাবে।

মিঃ বললেন, তা ত দেখছি বাচ্চাদের মন বোঝা বড় শক্ত, আর তোমার জন্যেই হল এটা। মিসেস চটে যান, আবার সেই কথা। তোমার মেয়েকে যা-তা হতে দিতে পারি না। এইটিই আমার অপরাধ হল ? শোনো—

না না, তা বলছি না—আমাদের কলকাতায় ত ফিরতেই হবে, তা তোমার বোনের বাড়িটা একবার বেড়িয়ে গেলে কেমন হয়।

ভালই হয়। সে ত কত দুঃখ করে, তাছাড়া ওখানে ত্রিবেণী সংগমে স্নান করলে হয়ত আমরা শান্তি ফিরে পাব।

আবার বাঁধা-ছাঁদা শুরু হল।

ওঁরা চলে এলেন এলাহাবাদে। ওখানে দিন দুই মাত্র থাকার প্ল্যান। দ্বিতীয় দিনে সংগমে স্নানের কথা। লাভলি একমনে গংগার দৃশ্য দেখছে। মিস্টার আর মিসেস ওকে ভৃত্যের সংগে বসিয়ে রেখে স্নান করতে নামলেন। সংগে লাভলির মাসীও আছেন।

স্নান সেরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গাড়িতে ওঠা আর কি। গাড়িটা পার্ক করা আছে রাস্তার অপর পারে একটু তফাতে। লাভলিকে ওর মাসী আন্টি আদর করছেন, ততক্ষণে মিস্টার ও মিসেস হিংগোরানী রাস্তা পেরিয়ে গাড়িতে উঠেছেন, ডাকছেন লাভলিকে।

লাভলি হঠাৎ তীরবেগে ছুটে রাস্তা পার হতে যাবে আর একটা গাড়ি ছুটে আসছে যমের মতো, তার ঘাড়ে এসে পড়ল বলে—ঠিক এমনি সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন ছুটে গিয়ে ওর হাতটা ধরে টেনে সরিয়ে নিল। গাড়িটা লাভলির ফ্রক ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল।

মিসেস হিংগোরানী দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকেছিলেন। চোখ চেয়ে দেখেন, একি ? ও যে তাঁদের খুব ভাল করে চেনা ছেলে—

ততক্ষণে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন হবে লোক জমে গেছে। চিৎকার শুনে পুলিশও এসেছে। সবাই হায় হায় করতে করতে থেমে গিয়েছিল। যে উদ্ধার করল সে তখনও লাভলির হাত ধরে আছে। পুলিশ বলল, বড় সময়ে তুমি হাত ধরে টেনে ওকে বাঁচিয়েছ। বড় হিম্মৎওয়ালা ছোকরা তুমি আছ—সকলে ভাল করে চেয়ে দেখে ছোকরাটি একটি বড় সাইজের পুতুল।

রোবু বলল লাভলিকে, ও রকম করে রাস্তা পার হতে হয় কি ? ভাগ্যিস আমি হিসেব করে দেখেছিলুম গাড়িটা যে স্পীডে আসছে তাতে তোমায় চাপা দিতে পারে।

লাভলির মুখে হাসি—রোবু, তোমায় যে আমি ভিড়ের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলুম।

মিঃ হিংগোরানী গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন, সবার মুখে প্রশংসা শুনবেন কি লাভলি হাসি হাসি মুখে বলল, ড্যাডি, হিয়ার ইজ মাই রোবু।

মিঃ হিংগোরানী অবাক হয়ে বললেন, তুমি কলকাত থেকে এখানে এলে কি করে ?

জবাব দিল মিঃ মিশ্রের লোক। সে বলল, এটিকে কিনেছেন আমার মনিব। তাঁর সংগেই ও এসেছে।

হতেই পারে না, আসলে ও যে আমাদের জিনিস। আসুন, সবাই আপনার মিশ্র-র বাড়িতে যাব ; তাকে সব খুলে বলতে হবে।

রোবু বলে ওঠে, বিরজু আমায় চুরি, মানে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে—

মিঃ মিশ্র অনেক কথার পর ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে স্বীকার করতে হল এক স্মাগলারের কাছ থেকে কিনেছেন ঐটি। দয়া করে আমার নামটা পুলিশে দেবেন না।

মিঃ হিংগোরানী বুঝিয়ে দিলেন, ওর সমস্ত স্বত্ব তাঁর এবং প্রোফেসার বুদ্ধিধরের।

তারপর আর কি? রোবুকে নিয়ে হিংগোরানীরা ফিরলেন কলকাতায়। মিসেসের মনটা এখন একেবারে বদলে গেছে। তিনি বললেন, রোবুই আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছে—এটা চোখের সামনে দেখেছি আমি। ওকে আবার ফিরিয়ে দেব, এতবড় অকৃতজ্ঞ আমি নই—ও থাকবে আমাদের বাড়িতে।

লাভলি ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহমধুর কণ্ঠে বলল, সামুমী! হাউ গুড্ ইউ আর!

॥ সমাপ্ত ॥